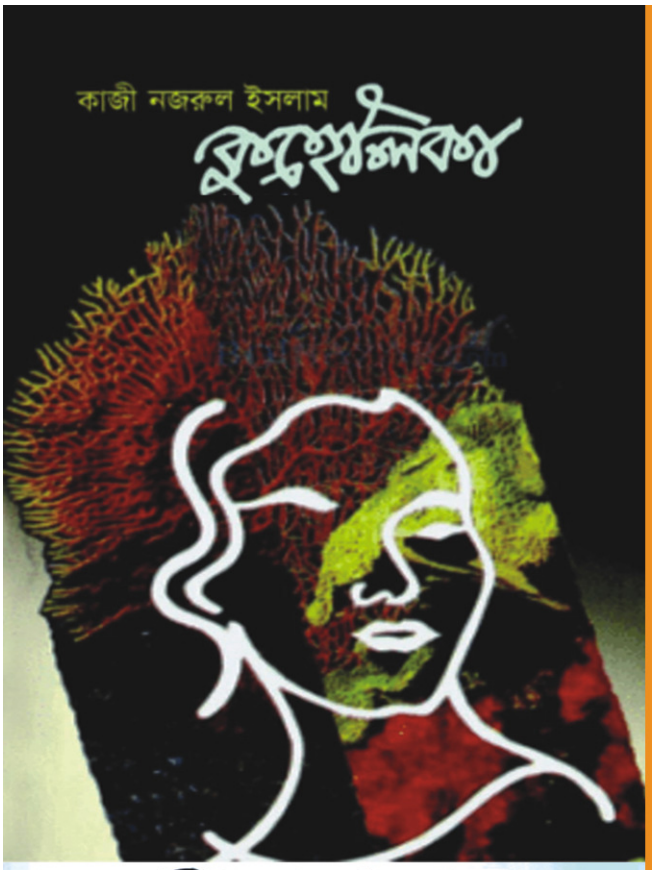

জানুয়ারি ২০২৩

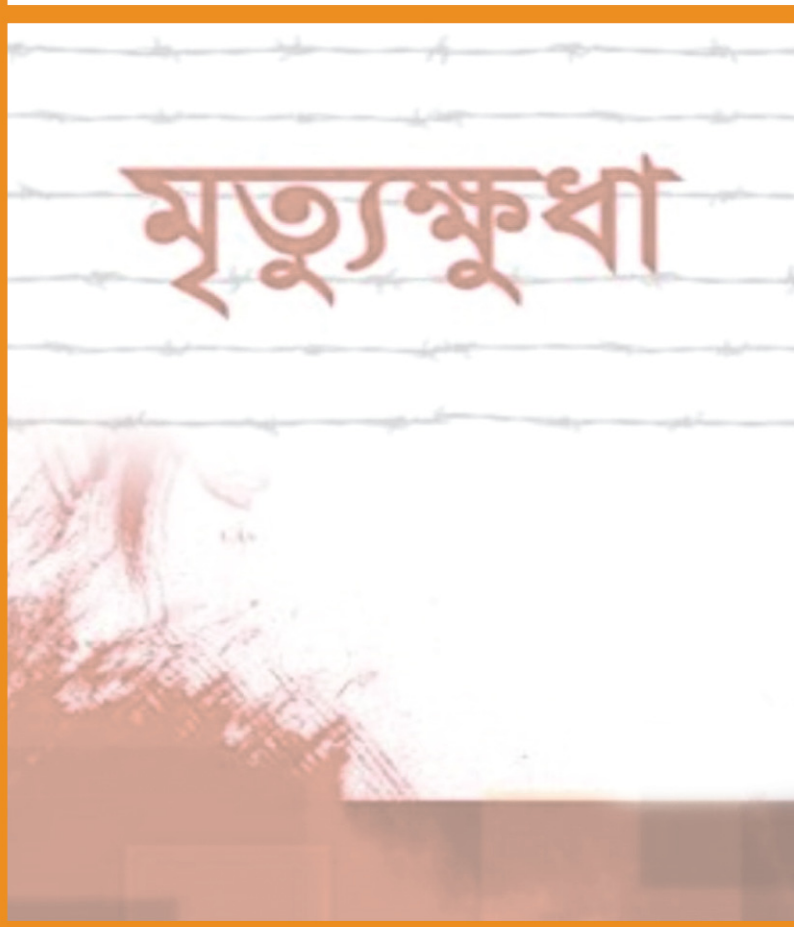

বিশেষ বীক্ষণ ঃ ঔপন্যাসিক নজরুল

আর নয় ভেলোর

M.R.HOSPITAL

Sharing Love, Caring Humanity

YOUR HEALTH IS OUR PRIORITY

আমাদের পরিষেবা সমূহ

- বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
- ফিজিক্যাল মেডিসিন
- ফেয়ার প্রাইস প্যাথলজি
- এন্ডোস্কপি
- ব্রঙ্কোস্কপি
- সি টি স্ক্যান
- সাইক্রিয়াট্রিক
- ই.এন.টি ও হেড নেক
- সার্জারি
- কেমোথেরাপি
- ডেন্টাল
- ফেসিও ম্যাগজিলারী
- সার্জারি
- জেনারেল মেডিসিন
- জেনারেল সার্জারি
- নিউরো ও স্পাইন সার্জারি
- ওপেন ও ল্যাপরোস্কপি
- সার্জারি
- কার্ডিওলজি
- পেসমেকার
- স্ত্রী-রোগ
- হাই-রিস্ক প্রেগন্যান্সি
- পোষ্ট কোভিড ক্লিনিক
- চোখের যাবতীয় চিকিৎসা
- ও.পি.ডি
- আ.সি.ইউ
- এন.আই.সি.ইউ.
- ২৪ ঘন্টার ইমার্জেন্সিও ট্রমা
- কেয়ার
- জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট (কোমর ও হাঁটু)
- অত্যাধুনিক ল্যাবোরেটরি
- ডায়াগানোস্টিক
- ইন্ডোর ও আউটডোর পরিষেবা
- পেইন ক্লিনিক
- এক্স-রে
- ডায়ালিসিস
- ব্লাড ব্যাঙ্ক
- শিশু ও নবজাতক রোগ বিশেষজ্ঞ
- চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞ
- শারীরিক ঔষধ ও পুর্নবাসন
- ইউ.এস.জি
- বক্ষ রোগ বিশেষজ্ঞ
- চর্ম রোগ বিভাগ
- ডায়াটেশিয়ান
- AC/ICU অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা
- ভরসা কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা
- কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত
- স্বাস্থ্য পরিষেবা
- সকল প্রকার Health Insurance

M.R. HOSPITAL

Vill. & P.O - Balisha, P.S. - Ashoknagar , North 24 Parganas,
Near Bira Rail Station West Bengal , Pin - 743234

9734214214
9051214214

24/7 Emergency Services

www.mrhospital.org

To prepare yourself as an Ideal Teacher,
Join our Institutions...

M.R. COLLEGE OF EDUCATION
(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.
BIRA, BALISHA, P.S- ASHOKNAGAR, (N) 24 PGS, WB-743234
www.mrctrust.org, Email- mrctrust2012@gmail.com
Phone- (03216)-261082, Mobile- 9933163040

SAHAJPATH
(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.
BIRA, BALISHA, P.S- ASHOKNAGAR, (N) 24 PGS, WB-743702
www.sahajpath.org.in, Email- sahajpath2010@gmail.com
Phone- (03216)-260058, Mobile- 9932563040

MOTHER TERESA INSTITUTE
OF EDUCATION & RESEARCH
(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.
NADIHIAG, P.O- KAZIPARA, P.S- MADHYAMGRAM, (N) 24 PGS, KOL-125
www.mtiier.in, Email- secretary.mother@gmail.com
Mobile- 9051073449

DR. SHAHIDULLAH
INSTITUTE OF EDUCATION.
(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.
AMINPUR, P.O- SONDALIA, P.S- SASHAN, (N) 24 PGS, WB-74343
www.dsie.in, Email- secretary.dsie@gmail.com
Mobile- 9051072035

Founder
Dr. Jahidul Sarkar
Mobile- 9734416128 / 7001575522

মীর রেজাউল করিম কর্তৃক ৩৮, ডা. সুরেশ সরকার রোড,
পশ্চিম ব্লক (দ্বিতীয় তল), কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত

Al-Ameen Mission

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah, Ph.: 74790 20059
Central Office: 53B Elliot Road, Kolkata 700 016, Ph.: 74790 20076

SUCCESS AT A GLANCE : 2020

Dazzling Record in NEET (UG)

Marks 626 & above Within AIR 9908	61	Marks 600 & above Within AIR 20174	134	Marks 580 & above Within AIR 30431	238
Marks 565 & above Within AIR 39289	322	Marks 550 & above Within AIR 49260	434	Marks 536 & above Within AIR 59825	516

AIR 916 (675)
Jisan Hossain

AIR 1276 (670)
Tanbir Ahmed

AIR 1522 (666)
Md Samim

AIR 1982 (662)
Ayesha Khatun

AIR 2298 (660)
Al Taufeeq

AIR 2817 (656)
Kanen Akhtar

AIR 2947 (655)
Md Tarip Sk

Higher Secondary (12th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBCHSE	Science	2090	909	1928	2072	2089
	Arts	79	43	66	78	79
CBSE	Science	54	8	24	43	54
	Total	2223	960	2018	2193	2222

Appeared 2223	
From Poor & BPL families	605 (27%)
From lower-middle income group	775 (35%)
From middle & upper middle income group	843 (38%)

81 students have occupied their positions within 20 ranks in the H.S. exminations of the Council

2nd 498 (99.6%) Md Talha

7th 493 (98.6%) Shayma Sultana

9th 491 (98.2%) Qaseed Akhtar

9th 491 (98.2%) K Abdul Halim

9th 491 (98.2%) Junaid Ahmmed

Secondary (10th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBBSE	Boys & Girls	1706	461	1211	1557	1668
CBSE	Boys & Girls	71	21	48	64	70
	Total	1777	482	1259	1621	1738

Appeared 1777	
From Poor & BPL families	627 (35%)
From lower-middle income group	680 (38%)
From middle & upper middle income group	470 (27%)

15 students have occupied their positions within 20 ranks in 10th exam.

7th 686 (98%) S Md Tameem

8th 685 (97.9%) Md Tahenuzzaman

15th 678 (96.7%) Mir Mousumi

16th 677 (96.7%) Sk Atiulla

17th 676 (96.6%) Sk Tafhim

মাসিক

উজ্জীবন

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর মুখপত্র

জানুয়ারি ২০২৩
কলকাতা

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ

সভাপতি : আমজাদ হোসেন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

কোষাধ্যক্ষ: মীর রেজাউল করিম

উজ্জীবন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

নির্বাহী সম্পাদক : ইনাস উদ্দীন, জাহির আব্বাস

সম্পাদক মণ্ডলী :অনিকেত মহাপাত্র, আজিজুল হক, আবু রাইহান, আমিনুল ইসলাম, তৈমুর খান, পাতাউর জামান, ফারুক আহমেদ, মীজানুর রহমান, মুসা আলি, মুহম্মদ মতিউল্লাহ, শেখ হাফিজুর রহমান, সাজেদুল হক, সুজিতকুমার বিশ্বাস

উপদেষ্টা মণ্ডলী :আলিমুজ্জমান, খাজিম আহমেদ, জাহিরুল হাসান, মিলন দত্ত, মীরাতুন নাহার, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, লোকমান হাকিম, সামশুল আলম, স্বপন বসু

প্রচ্ছদ : প্রিয়ব্রত ভাণ্ডারী
নাম-লিপি : সম্বিত বসু

বর্ণ সংস্থাপন : বর্ণায়ন

বিনিময় : ৫০ টাকা

যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭, ৯৫৬৪৩৪২৪৭১, ৯৭৩২১৬৬৩৩৪

ই মেল : ujjibanmag@gmail.com, aliahsanskriti@gmail.com

ই মেল এ লেখা পাঠান অথবা ব্যবহার করুন এই ঠিকানা :

মীর রেজাউল করিম, ৩৮ ডা. সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিম ব্লক (তৃতীয় তল), কলকাতা-১৪

প্রাপ্তিস্থান : **কলকাতা**

পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, নিউ লেখা প্রকাশনী, মল্লিক ব্রাদার্স, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

'উজ্জীবন' আলিয়া-র রূপান্তরিত রূপ

সংসদ-বৃত্তান্ত ২০২২

- **উৎসব-অনুষ্ঠান**

২৭ ফেব্রুয়ারি, রবিবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়ামে মইনুল হাসান এর সভাপতিত্বে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'উজ্জীবন ২০২২' সম্পন্ন হয়। একাধিক পর্বে বিন্যস্ত অনুষ্ঠানের সূচনায় স্বাগতভাষণ প্রদান করেন সংসদ-সভাপতি আমজাদ হোসেন। সংসদের লক্ষ্য ও কার্যক্রম নিয়ে কথা বলেন সম্পাদক সাইফুল্লা। বিভাগীয় অধ্যক্ষ মুহম্মদ আফসার আলি (সামাজিক গবেষণা), শেখ কামাল উদ্দীন (উৎসব-অনুষ্ঠান), সেখ হাফিজুর রহমান (প্রকাশনা), আনোয়ার সাদাত হালদার (ডকুমেন্টারি), জাহির আব্বাস (পত্রিকা) তুলে ধরেন তাঁদের নিজ নিজ বিভাগের কার্যক্রম। পুরস্কার প্রদান, বই প্রকাশ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক ডকুমেন্টারির উদ্বোধন ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ। দিনের শেষে আগত সুধীজনদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কোষাধ্যক্ষ মীর রেজাউল করিম।

- **পুরস্কার প্রদান**

২৭ ফেব্রুয়ারি, সংসদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'উজ্জীবন ২০২২' এর প্রেক্ষিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এবারের পুরস্কার প্রাপক ছিলেন —আবদুর রাউফ, চিন্তাবিদ (শহীদুল্লাহ পুরস্কার), রহিমা খাতুন, সমাজকর্মী (রোকেয়া পুরস্কার), মনোরঞ্জন ব্যাপারী, সাহিত্যিক (মশাররফ পুরস্কার)।

- **প্রকাশনা**

জীবনীমালা-১ : নেপথ্য-নায়ক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন— খন্দকার মাহমুদুল হাসান
জীবনীমালা-২ : মৌলবি মুজিবর রহমান ও 'দ্য মুসলমান'—মিলন দত্ত
জীবনীমালা-৩ : বাঙালির নবজাগরণ ও ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী—সামশুল আলম

- **উজ্জীবন**

জানুয়ারি ২০২২। মুদ্রণ ১০০০ কপি
ফেব্রুয়ারি ২০২২। মুদ্রণ ১০০০ কপি
মার্চ ২০২২। মুদ্রণ ৫০০ কপি
এপ্রিল ২০২২। মুদ্রণ ৫০০ কপি
মে-জুন ২০২২। মুদ্রণ ৫০ কপি

- **স্মারক বক্তৃতা**

২২ জানুয়ারি ২০২২। নেতাজী সুভাষ স্মারক বক্তৃতা : ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব ও ভারত;সূচকভাষণ–সামসুল হালসোনা; আলোচক—সুমিতা দাস; সভামুখ্য—আমজাদ হোসেন

- **আলোচনাসভা**

মুখ্যত ইংরেজি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার (ব্যতিক্রম আছে) সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট থেকে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- **৮ জানুয়ারি :** ইসলাম, দেশভ্রমণ ও ভ্রমণকাহিনি—আমজাদ হোসেন; সভামুখ্য—একরাম আলি
- **১২ ফেব্রুয়ারি :** পুলিশ প্রশাসন ও নাগরিক সমাজ : দায়বদ্ধতার সমীকরণ—মহিউদ্দিন সরকার; সভামুখ্য —আমজাদ হোসেন
- **১৯ ফেব্রুয়ারি :** সাম্প্রদায়িকতা ও গণনিধন : নাগরিক দায়বদ্ধতা—কাজী মোহাম্মদ শেরিফ, সভামুখ্য —আমজাদ হোসেন
- **৫ মার্চ :** মাওলানা আকরম খাঁ :জীবন ও কৃতি—আবদুল্লাহ বীন সাইদ জালালাবাদী; সভামুখ্য—আমজাদ হোসেন
- **১৯ মার্চ :** প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙালি জাতিসত্তার প্রতিফলন—সনৎকুমার নস্কর; সভামুখ্য—আমজাদ হোসেন
- **৭ মে :** মুঘল আমলে ভারতের জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার, বিশেন্দু নন্দ; সভামুখ্য—আমজাদ হোসেন
- **১১ জুন :** কৃষ্ণনগরে নজরুল—ইনাস উদ্দীন; সভামুখ্য— আমজাদ হোসেন
- **২৫ জুন :** আধুনিক ভারত নির্মাণে মহাত্মা রামমোহন—খাজিম আহমেদ; সভামুখ্য—আমজাদ হোসেন
- **২ জুলাই :** রামমোহন : যুগজিজ্ঞাসা—কণিষ্ক চৌধুরী; সভামুখ্য—আমজাদ হোসেন
- **২৩ জুলাই :** নাট্যকার নজরুল : এষণা; প্রতীতি—শেখ কামাল উদ্দীন
- **৩০ জুলাই :** স্বপ্ন - সিনেমা - জীবিকা—মুজিবর রহমান; সভামুখ্য—আমজাদ হোসেন

- **১৭ সেপ্টেম্বর :** সংবাদ মাধ্যম, সাংবাদিকতা ও আমরা— কাজী গোলাম গউস সিদ্দিকী; সভামুখ্য—আমজাদ হোসেন
- **২৪ সেপ্টেম্বর :** মুহম্মদ নুরুল হক, আল ইসলাহ পত্রিকা ও কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ—নন্দলাল শর্মা (বাংলাদেশ); সভামুখ্য—আমজাদ হোসেন
- **২২ অক্টোবর :** মানবতন্ত্রী গৌরকিশোর ঘোষ—খাজিম আহমেদ; সভামুখ্য—আমজাদ হোসেন
- **১২ নভেম্বর :** উপন্যাস-চর্চা—স্বভূমি (কামাল হোসেন)- সাইফুল্লা, সুখলতার ঘর নেই (হরিশংকর জলদাস)-পাতাউর জামান, রুকসানা (আশরাফুল মণ্ডল)-জাহির আব্বাস; সভামুখ্য—আমজাদ হোসেন
- **২৬ নভেম্বর :** উপন্যাস পাঠ : ঔপন্যাসিকের সঙ্গে— ফকির-ডোমের আখ্যান (সেখ নজরুল ইসলাম)-রমজান আলি, বনবিবি (মুসা আলি)-মনোরঞ্জন সরদার; সভামুখ্য—আমজাদ হোসেন
- **২ ডিসেম্বর :** সিরাতুন্নবী ২০২২—মীর রেজাউল করিম (সূচক ভাষণ), মহিউদ্দিন সরকার (আলোচক), রেজাউল হক (আলোচক), শাহনওয়াজ আলি রাইহান (আলোচক); সভামুখ্য—আমজাদ হোসেন
- **১০ ডিসেম্বর :** রোকেয়া এষণা; প্রতীতি—সাইফুল্লা; সভাপতি—মীরাতুন নাহার
- **২৪-২৫ ডিসেম্বর:**
  আরবি : ঐতিহ্য-নির্মাণের পরম্পরা-আজকের বাস্তবতা; সভাপতি—আমজাদ হোসেন ও মীর রেজাউল করিম; স্বাগতভাষণ—শাহনওয়াজ আলি রাইহান (গবেষক, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়); আলোচক : মেহেদি হাসান (অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), আব্দুল মতিন (অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, সরকারি মহিলা সাধারণ ডিগ্রি কলেজ), ইফতিখারুল আলম মাসউদ (অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ), মাহাদি হাসান (অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ), আরিফ রব্বানি (শিক্ষার্থী, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়), সাইদুর রহমান (অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)

- **নাগরিক বীক্ষণ**

  সমাজ জীবন বিশেষভাবে আলোড়িত হচ্ছে এমন বিষয় নির্ভর আলাপ-আলোচনা, যেখানে অন্য আলোচনাসভার মতো বক্তাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী সকলের জন্যই নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ ছিল।
  - **১৭ এপ্রিল :** শিক্ষার অধিকার ও পোষাকবিধি : সম্পর্কের সমীকরণ
  - **২০ আগস্ট :** প্রেক্ষিত—মাদ্রাসায় নিযুক্ত ভূতুড়ে শিক্ষক; পর্ব-১
  - **২৭ আগস্ট :** প্রেক্ষিত—মাদ্রাসায় নিযুক্ত ভূতুড়ে শিক্ষক; পর্ব-২

- **গুণীজন সংবর্ধনা ও সংস্কৃতি-বীক্ষণ : ৫ জুন**

  সামাজিক ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার সাপেক্ষে মহিউদ্দিন সরকার (সমাজসেবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব) কে 'মুনসি মেহেরুল্লা সম্মাননা ২০২২' এ ভূষিত করা হয়। সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি ওই দিন 'সংস্কৃতি-বীক্ষণ' শিরোনামে একটি আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন—
  - **মুসা আলি**—পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজে সাহিত্যচর্চা : সমস্যা ও সম্ভাবনা
  - **আজিজুল হক**—পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজে সংবাদ-সাময়িকরপত্র সম্পাদনা : সমস্যা ও সম্ভাবনা
  - **তারাপদ দাস**—সুন্দরবন অঞ্চলের সমাজ-উন্নয়নে নীলদিগন্ত সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্রের ভূমিকা
  - **সেলিম দুরানি বিশ্বাস**—পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজে বাচিকশিল্পেরচর্চা : সমস্যা ও সম্ভাবনা
  - **রুহুল আমিন**—পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত সামাজিক সংগঠন ও তার কার্যধারা

  স্থান : সিলভার স্ফুন ব্যাঙ্কোয়েট সভাকক্ষ, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

- **সাহিত্যবাসর**
  - **৩ সেপ্টেম্বর :** বই-চিত্র, কলেজস্ট্রিট, কফিহাউস। কবিতা পাঠ, সাহিত্যালোচনা, পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বিষয়টি সম্পন্ন হয়। প্রকাশিত হয় 'এবং সংস্কৃতি' পত্রিকা-র 'আমাদের গ্রাম' বিশেষ সংখ্যা।

আমাদের কথা

নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশভাগের পরে এপার বাংলায় পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজে গত বিশ-ত্রিশ বছরে বেশ একটা শিক্ষিত সমাজ তৈরি হয়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম মুখ উঠে আসছে। এমন অবস্থায় ক্রমবিকশিত এই সমাজের জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার উপযোগী এক বা একাধিক মননশীল পত্রিকা থাকা আবশ্যক। এই ভাবনাকে সামনে রেখেই আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অধ্যাপক, শিক্ষার্থী, প্রাক্তনী এবং শুভানুধ্যায়ীর উদ্যোগে 'আলিয়া' নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সার্বিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয় 'আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ' নামের সংগঠন।

বেশ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর 'আলিয়া' নামটি পরিবর্তিত হয়ে 'উজ্জীবন' হয় এবং পত্রিকাটি মাসিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু এরকম একটা উদ্যোগে স্বাভাবিক নিয়মেই যা ঘটে থাকে —নানান প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় 'উজ্জীবন'-কে। কোভিড পরিস্থিতির ফলে অনেক কিছুই ওলট-পালট হয়ে যায়, পত্রিকার প্রকাশও অনিয়মিত হয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও এই প্রতিবন্ধকতার বেড়া সেইভাবে ডিঙানো সম্ভব হয়নি, 'উজ্জীবন'-এর বহমানতা বিনষ্ট হয়েছে বারে বারে। মে-জুন যুগ্ম সংখ্যার পর ২০২২ সালে আর কোনও সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। যদিও পরিকল্পনার জাল বিছানো হয়েছিল অনেক দূর পর্যন্ত। অবশ্য এতে আমরা তেমন বিচলিত নই। স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়াই স্বাভাবিক। স্বপ্ন দেখাটাই বড়ো কথা। আমরা এখনো স্বপ্নের আকাশে পাখা মেলতে পারছি পূর্ণমাত্রায়; এটাই আমাদের অসামান্য পাথেয়।

একটা বড়ো লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে বারংবার বাধা আসবে; এটা স্বীকার করে নিয়েই আবার আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এ কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না, যে সাংস্কৃতিক সাক্ষরতা ব্যতিরেকে কোনো জাতি, কোনো সম্প্রদায় কখনো সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই সাংস্কৃতিক সাক্ষরতার প্রথম সোপান হল পত্র-পত্রিকা। পত্র-পত্রিকার আশ্রয়েই একটি জনগোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতি চেতনার মূলে জলসেচ করে, কালক্রমে ঘরে তুলতে পারে সোনার ফসল। ইতিহাসে এর নানান সাক্ষ্য রয়েছে। বেশি দূর যেতে হবে না। ঘরের কথাতেই আসা যাক। স্বাধীনতাপূর্ব ঘূর্ণাবর্তে বিধ্বস্ত বাঙালি মুসলমান সমাজ সংস্কৃতি চর্চার প্রশ্নে পায়ের নিচে নতুন করে মাটি খুঁজে পেয়েছিল 'মোহাম্মদী', 'সওগাত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতির আশ্রয়ে। দেশভাগের পর শিক্ষিত ও গুণী ব্যক্তিদের অনেকেই ওপার বাংলায় চলে যাওয়ার ফলে এপারের মুসলিম সমাজ স্বভাবতই একটা অন্ধকার আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। তারই মধ্যে 'জাগরণ', 'পয়গাম', 'কাফেলা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাকে অবলম্বন করে মুসলিম সমাজে সাহিত্য প্রতিভা কিছুটা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। আব্দুল জব্বার, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আব্দুর রাকিবদের মতো প্রতিভার জন্ম ও উত্তরণ অনেকখানি সম্ভব হয়েছিল এইসব পত্র-পত্রিকাকে অবলম্বন করে।

'কাফেলা'-র পথ চলা থেমে গেছে সেও প্রায় অর্ধশতাব্দী হতে চলল। এই দীর্ঘ সময়ে নতুন করে কোনো মাসিক সাহিত্য পত্রিকার উত্থান হয়নি। বিক্ষিপ্ত কিছু প্রয়াস হয়েছে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সামগ্রিকভাবে সমাজ-জীবনকে তেমন আলোড়িত করতে পারেনি। বলা বাহুল্য, এর ফল হয়েছে অত্যন্ত ভয়াবহ। সবচেয়ে সমস্যা হয়েছে উদীয়মান সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে। মুসলিম সমাজ থেকে যারা লেখালেখি করতে অগ্রসর হয়েছেন সংখ্যাগুরু মানসিকতার

কারণে তথাকথিত মূল ধারার পত্র-পত্রিকাগুলিতে তারা খুব একটা সমাদর পাননি। লেখার বিষয়ের ক্ষেত্রেও যেখানে মুসলিম সমাজের অন্ধকার দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে সেইরকম লেখাগুলি অধিক সমাদৃত হয়েছে।

সেই বঙ্কিম যুগ থেকে মুসলিম সমাজকে ব্যঙ্গাত্মক এবং নিম্নদৃষ্টিতে দেখা আর তার সমান্তরালে শিক্ষিত মুসলিম সমাজের জেগে ওঠা হীনম্মন্যতা —এসবের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে। শিক্ষিত মুসলিম সমাজে শতকরা একজনকেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ যিনি নিয়মিত পত্র- পত্রিকার পাতায় চোখ রাখেন, বইপত্র কেনেন এবং ধারাবাহিকভাবে উপন্যাস গল্প ইত্যাদি পাঠ করেন। অথচ খোলা চোখে একবার তাকিয়ে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, যে এই বাংলার মফস্‌সলে, প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জের আনাচে-কানাচে অনেক উদীয়মান সাহিত্যিক যথেষ্ট বলিষ্ঠ কলমে তাঁদের লেখালেখি চালিয়ে যাচ্ছেন। অপরাপর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিভা উঠে আসছে। কিন্তু বৃহত্তর পাঠকের দ্বারা সিঞ্চিত না হলে কোনো সাহিত্যকৃতিই সত্য হয়ে ওঠে না, স্বীকৃতি পায় না। ফলত যারা মননশীল প্রতিভা নিয়ে উঠে আসছেন একটা সময় তারা হতাশায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছেন। এই অন্ধকারের আবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আলোকিত অঙ্গনে পা রাখার একটাই পথ—একটা সমৃদ্ধ পাঠক-গোষ্ঠী তৈরি করা এবং তাদের কাছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বর্তমান মনন ও প্রতিভাকে পৌঁছে দেওয়া। বাস্তবে প্রায়শ দেখা যায়, অনেক গুণমানে সমৃদ্ধ বই প্রচার-অভাবে শিক্ষিত সমাজের কাছে, উপযুক্ত পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারে না।

সমস্যা আছে, তবু আমাদের বিশ্বাস এই সমস্যা এমন কিছু দুঃসাধ্য নয় যাকে অতিক্রম করা যাবে না। 'উজ্জীবন' পত্রিকার মাধ্যমে আমরা সেই উদ্যোগটাই নিতে চেয়েছি, যে এই বাংলায় সার্বিকভাবে একটি পাঠক গোষ্ঠী তৈরি হোক, তার সঙ্গে সর্বাত্মক জাগরণ ঘটুক উদীয়মান লেখক গোষ্ঠীর। বর্তমানে প্রতি মাসে একশত কি দুইশত টাকা বইপত্র কিংবা পত্র-পত্রিকা কেনার জন্য খরচ করা আমাদের অনেকের কাছেই এমন কিছু ব্যাপার নয়। শিক্ষিত মুসলিম সমাজ প্রতি মাসে এই খরচটুকু করুক — এই বার্তাটা ছড়িয়ে দিতে হবে। বই কেনার অভ্যাস তৈরির লক্ষ্যে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। আমরা হিসেব করে দেখেছি, একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশকে অব্যাহত রাখার জন্য বার্ষিক ৬ থেকে ৮ লক্ষ টাকা যথেষ্ট। যদি ৫০০ টাকা করে গ্রাহক মূল্য নির্ধারণ করা হয় তবে ১২০০ থেকে ১৫০০ গ্রাহক হলেই এই খরচ উঠে আসা সম্ভব। বর্তমানে আমাদের যা আর্থ-সামাজিক অবস্থা তাতে এমন সংখ্যক গ্রাহক সংগ্রহ করতে তেমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

আমরা জানি, কোনও স্বপ্নই একদিনে পূর্ণ হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন আছে, উদ্যোগের এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টারও প্রয়োজন আছে। একটা পাঠক সমাজ তৈরি করতে হলে কাউকে না কাউকে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নিতেই হয়। আমরা 'আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ' এর পক্ষ থেকে এক্ষেত্রে কিছুটা কাজ করতে চাইছি। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ— আপনি নিজে বার্ষিক ৫০০ টাকার বিনিময়ে 'উজ্জীবন' এর গ্রাহক হন; এ বিষয়ে আপনার নিকটজনকে উৎসাহিত করুন। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকছি, ডাকযোগে কিংবা লোক মারফত যথা সময়ে প্রতিটি গ্রাহকের কাছে পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া হবে।

একথা আরও একবার উল্লেখ করা যেতে পারে, যে গত বিশ-ত্রিশ বছরে এপার বাংলায় মুসলিম সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষিতজনের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, আধিকারিক, শিক্ষক, আইনজীবী সহ নানান ক্ষেত্রে শিক্ষিত মুসলিম ব্যক্তিত্ব উঠে এসেছেন, আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হতে চলেছে। কিন্তু স্বীকার করতে হবে, যে সেই তুলনায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এখনো আমরা অনেকটা পিছিয়ে রয়েছি। আমরা যারা একটু সচেতন, নিজেদেরকে শুভবোধ সম্পন্ন মানুষ বলে দাবি করি তাদের সবারই এই দিকটি নিয়ে ভাবার, কিছু উদ্যোগ নেওয়ার, কমপক্ষে পরিকল্পিত উদ্যোগে অংশগ্রহণ করার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। আসুন, ছোটখাটো সব মত পার্থক্য এবং ভাবনার ভিন্নতাকে সরিয়ে রেখে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার এই উদ্যোগে আমরা সবাই মিলে সামিল হই; চলার এই পথটাকে আরো সুগম ও মসৃণ করে তুলি।

উজ্জীবন-এর স্বজন

- **২৪ পরগনা-উত্তর**
  আমিনুল ইসলাম, বারাসাত, ৯৪৩৩২৩১২০৪
  মশিহুর রহমান, রাজারহাট, ৮০১৭৩৪৩১৫৬
  হাকিমুর রশিদ, হাবড়া, ৯৭৪৮৮৫১১৭৬
- **২৪ পরগনা-দক্ষিণ**
  আব্দুল আজিজ, সংগ্রামপুর, ৮১৪৫৪৪৪১৯৫
  আসাদ আলি, ভাঙ্গড়, ৯১২৩৬৮৯৬১৫
  মুসা আলি, জয়নগর, ৯১৫৩১৩৫৪৬৮
- **কোচবিহার**
  মাহাফুল আলম, দীনহাটা, ৯৫৬৩৩৭৩১১৪
  সুরাইয়া পারভিন, কোচবিহার সদর, ৮৭৬৮২৭৩৯১২
- **জলপাইগুড়ি**
  আরমান সেলিম, ৯০৯৩৮৮৫৫৪৬
- **দিনাজপুর-উত্তর**
  আসফাক আলম, ৭৯৮০৪৩৪৬২৫
- **দিনাজপুর-দক্ষিণ**
  মীরাজুল ইসলাম, ৮৭৭৭৬৮৯৬৫১
- **নদীয়া**
  সাজাহান আলী, কৃষ্ণনগর, ৯৪৩৪২৪৫২৬২
  সুজিত বিশ্বাস, করিমপুর, ৮৯১৮০৮৯৯৬৩
  হরিদাস পাটোয়ারী, রাণাঘাট, ৬২৯৫৮২৭৬৪৫
- **পুরুলিয়া**
  মহম্মদ খুরশিদ আলম, ৯৯৩২২৬৩৩৭৮
- **বর্ধমান-পশ্চিম**
  আমিরুল ইসলাম, দুর্গাপুর, ৯৮৩২৭৪৯২৮৭
  আশরাফুল মণ্ডল, দুর্গাপুর, ৯৪৭৫৯৩৮৩৬৬
- **বর্ধমান-পূর্ব**
  কারিমুল চৌধুরী, বর্ধমান সদর, ৭০০১২৪৪২৮৮
  রমজান আলি, বর্ধমান সদর, ৯৪৩৪০১৪১১৭
  সামসুজ জামান, জামালপুর, ৬২৯০৯৫৬৪৫৪
  সোমা মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান সদর, ৯৫৩১৫৯৮৬৫৩
- **বাঁকুড়া**
  ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ, ৯৪৭৬২৬৮৫৫৪
- **বীরভূম**
  তৈমুর খান, রামপুরহাট, ৯৩৩২৯৯১২৫০
  ফজলুল হক, সিড়ডি, ৮২৪০৯৭৯০৯৩
  মেহের সেখ, লাভপুর, ৮৫০৯১০২১৫৪
- **মালদা**
  আবদুল মালেক, মালদা সদর, ৯৫৯৩৭০৬০০৭
  জুলফিকার আলি, চাঁচল, ৯৭৩৪১৯২১৭৫
  মহঃ ইব্রাহিম, মালদা সদর, ৮৯৭২৫১৯৮৭৯
  শাহ নওয়াজ আলম, কালিয়াচক, ৭০০১২৭৪৯১৫
- **মেদিনীপুর-পশ্চিম**
  কামরুজ্জামান, খড়গপুর, ৯৯৩২২১৫০৩৪
  বিমান পাত্র, ঘাটাল, ৯৪৭৬৩২৯৩১২
  সেখ সাব্বির হোসেন, মেদিনীপুর সদর,
  ৯৬৭৯১৪৮১৭২
- **মেদিনীপুর-পূর্ব**
  আমিনুল ইসলাম, হলদিয়া, ৯০০২৩৭৯৪২৯
  ওয়াহেদ মীর্জা, এগরা, ৯১৬৩৩৮৭৬৬৭
  মোকলেসুর রহমান, কাঁথি, ৭০০৩৫৫৪০০৪
- **মুর্শিদাবাদ**
  আনোয়ারুল হক, বেলডাঙ্গা, ৯৭৩৫৯৪৭৯১১
  আলিমুজ্জমান, বহরমপুর, ৮৬৩৭৫৯৩৭৭২
  মহঃ বদরুদ্দোজা, ডোমকল, ৮০১৬১৬১৭৬৫
- **দার্জিলিং**
  অঙ্কুর মহন্ত, ৯৬৪১২৪২৪১১
- **হাওড়া**
  ইসমাইল দরবেশ, সাঁতরাগাছি, ৭০০৩৪৪৬৬৯৪
  মনিরুল ইসলাম, বাগনান, ৭৯০৮১৮৮০৭১
  সেখ নুরুল হুদা, বাগনান, ৯০৭৩৩১২১৮১
- **হুগলি**
  আনোয়ার সাদাত হালদার, ফুরফুরা শরীফ,
  ৮৯০২৪০৮৪২০
  মুজিবর রহমান, হরিপাল, ৯৬৩৫৭০৬২২০

উজ্জীবন : প্রাপ্তিস্থান

- অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ: বুক কর্ণার, ৯৪৭৫৯৫৩৩৪৫
- করিমপুর, নদীয়া: করিমপুর পুস্তক মহল, ৯৭৩৩৮১১৮১৯
- কলকাতা : পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, অপূর্ব, নিউ লেখা, মল্লিক ব্রাদার্স, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
- কৃষ্ণনগর, নদীয়া: বইঘর, ৯৭৩২৫৪১৯৮৪
- চাঁচল, মালদা : পুথিপত্র
- ডোমকল, মুর্শিদাবাদ: রিলেশন (বুকস্টল), ৯৭৩২৬০৯২১০
- দুবরাজপুর, বীরভূম : টিচার্স কর্নার
- বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান : রমজান অ্যাকাডেমী, ৮৭৭৭৩৯৬৬৩২
  বিবেকানন্দ বুক অ্যান্ড জেরক্স সেন্টার, ৯৩৭৮১৩২৬৮৭
- বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা : সাহা বুক স্টল, ৯৮৩২৮০৬৬৬৩
- বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ : বিশ্বাস বুক স্টল, ৯৮০০০০০০৪৯
  আদর্শ বুক সেন্টার, ৯৪৩৪৩৯৪৪৫২
- বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা : মল্লিক গ্রাফিক্স, ৯১৬৩৪৮৬৭৬৬
- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : অন্নপূর্ণা বুক হাউস, ৯৭৮৩৭৪৪৪৯৮
- বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর : কৃষ্ণ বুক হাউস, ৯৪৩৪৩৯৪২১২
- মালদা সদর, মালদা: আদর্শ পুস্তকালয়, ৯৫৯৩৭০৬০০৭
- মালদা সদর, মালদা: পুনশ্চ, ৯১২৬৫২৩৭৫৪
- মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর : মল্লিক পুস্তক বিপণি, ৯৯৩২০৫৭৬৬৭
- শিলিগুড়ি, দার্জিলিং: ইকনমিক বুক স্টল
- সংগ্রামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : ছাত্র সাথী, ৯৫৯৩৪৮২১৬৯
- সিউড়ি, বীরভূম : ভারত পুস্তকালয়

পূর্ব প্রকাশিত আলিয়া ও উজ্জীবন

- ***ত্রৈমাসিক আলিয়া***
  জানুয়ারি ২০১৫
  এপ্রিল ২০১৮ (বিশেষ বীক্ষণ—সোহারাব হোসেন)
  জুলাই ২০১৮ (বিশেষ বীক্ষণ—আমার চোখে ঈদ)
  অক্টোবর ২০১৮ (বিশেষ বীক্ষণ—আফসার আমেদ)
  মার্চ ২০১৯ (বিশেষ বীক্ষণ—আবদুর রাকিব)
  জুন ২০১৯ (বিশেষ বীক্ষণ—ওয়ালে মুহম্মদ)
- **মাসিক আলিয়া**
  মার্চ ২০২০
  আগস্ট ২০২০
  সেপ্টেম্বর ২০২০
  অক্টোবর ২০২০
  (কোভিদ ১৯ এর প্রেক্ষিতে পত্রিকা প্রকাশ ব্যাহত হয়। মার্চ ২০২০ মুদ্রিত হয়েছিল। অন্যগুলি ছিল সফট কপি)
- **পাক্ষিক আলিয়া**
  জুন, জুলাই, আগস্ট ও অক্টোবর ২০২০-তে যথাক্রমে দুটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেপ্টেম্বরে কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। অতঃপর পাক্ষিক আলিয়া বন্ধ হয়ে যায়।
  (পাক্ষিক আলিয়া ছিল ৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত, ৮টি করে নিবন্ধের সংকলিত রূপ। এর একটিও মুদ্রিত হয়নি। সবই ছিল সফট কপি।)
- ***মাসিক উজ্জীবন***
  মে ২০২১, জুন ২০২১, সেপ্টেম্বর ২০২১, জানুয়ারি ২০২২, ফেব্রুয়ারি ২০২২, মার্চ ২০২২, এপ্রিল ২০২২, মে-জুন ২০২২।

* নানা কারণে আলিয়া ও উজ্জীবন এর পথচলা ব্যাহত হয়েছে।

** আলিয়া বা উজ্জীবন এর সমস্ত সফট কপি বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯

সংখ্যা-সূচি

বীক্ষণ : ঔপন্যাসিক নজরুল

কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস 'কুহেলিকা' : পুনঃপাঠ—সুমিতা চক্রবর্তী, ১১
মৃত্যুক্ষুধা : সামাজিক বাস্তবতার অনন্য নির্মাণ—এটিএম সাহাদাতুল্লা, ১৮
বাঁধন-হারা : উপন্যাসের আড়ালে আত্মঘোষণা—জাহির আব্বাস, ২৬

কবিতা

আতিয়ার রহমান, আবদুস সালাম, জুলফিকার খান, সাহারুখ মোল্লা, ফিরোজা খাতুন, মহম্মদ বাকীবিল্লাহ মণ্ডল, মুসলিমা বেগম—৩৩-৩৫

উপন্যাস

ঘূর্ণাবর্ত—সেখ রফিকুল ইসলাম, ৩৬

গল্প

মনের আকাশে আলো—সেখ আব্দুল মান্নান, ৪১
স্বর্ণ-চাঁপার উপাখ্যান—সৈয়দ রেজাউল করিম, ৪৬

দেশের কথা

মুর্শিদাবাদ : আমদরবারে নবাব—মাজরুল ইসলাম, ৫২

দেশকাল

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি—সাইফুল্লা, ৫৫

সাক্ষাৎকার

মীরাতুন নাহার, ৫৭

প্রয়াণকথা

চলে গেলেন খবরের কাগজওয়ালা জয়নাল আবেদিন—আবদুল করিম, ৬৬

ফিরে দেখা

সম্পাদক এবাদুল হক ও 'আবার আসিব ফিরে'—নাফিসা ইয়াসমীন, ৬৭

সাংস্কৃতিক সংবাদ

পড়ে পাওয়া : চোদ্দোআনা নয় ষোলোআনাই—মামুদ হোসেন, ৬৮
বহরমপুরে শিশু বইমেলা, চাতক সাহিত্য সম্মেলন ২০২২, রোকেয়ার জন্মদিনে ভূমি-র সক্রিয়তা—ইনাস উদ্দীন, ৬৯

বই-কথা

নির্বাচিত কবিতা : তৈমুর খান, ৭১ কবিতাকাঁথা : নাসরিন, ৭২

লেনদেন

A/C 31590592615
1FSC : SBIN0001299
PHONEPE : 7872422313
GPAY : 9734662218
হোয়াটস্‌অ্যাপে (৮৬৩৭০৮৬৪৬৯) স্ক্রিন শট পাঠানোর অনুরোধ থাকছে

যোগাযোগ :

৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭,
৯৪৩২৮৮০২৪২
aliahsanskriti@gmail.com

উজ্জীবন

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ প্রকাশিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা
সুরেশ সরকার রোড, পার্ক সার্কাস, কলকাতা-১৪
যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৮৬৩৭০৯৩৬৩৮, ৯৭৩২১৬৬৩৪৪
ujjibanmag@gmail.com

- **পত্রিকা বিষয়ক প্রাসঙ্গিক তথ্য :**
  - সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে সৃষ্টিধর্মী ও মননশীল রচনা সংবলিত এই পত্রিকা প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।
  - প্রথমে এই পত্রিকা 'আলিয়া' নামে প্রকাশিত হতো। পরে পরিবর্তিত 'উজ্জীবন' নামে প্রকাশিত হচ্ছে।
  - 'আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ' মুখ্যত আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে গঠিত হলেও বর্তমানে এটি স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা।
  - আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ তথা উজ্জীবনের প্রধান লক্ষ্য এই বাংলায় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পিছিয়ে থাকা জনসমাজ, বিশেষত প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষিত মুসলিম সমাজে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং প্রগতিশীল ভাবনার চর্চা এবং প্রসারে উৎসাহ প্রদান।
  - বর্তমানে ৭২ পৃষ্ঠার ডাবল ক্রাউন সাইজের এই মাসিক পত্রিকার প্রতি সংখ্যার বিনিময় মূল্য ৫০ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা। এক সঙ্গে এক/দুই/তিন বছরের গ্রাহক চাঁদা গ্রহণ করা হয়।
  - গ্রাহক হতে আগ্রহী ব্যক্তি নিম্ন বিবরণগুলি পূরণ করে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির হাতে নগদে অর্থ প্রদান করতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপ মারফৎ নিম্ন বিবরণগুলি উল্লেখ করে উপরোক্ত নম্বরে ফোন পে মারফত অথবা উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে গ্রাহক চাঁদা পাঠাতে পারেন।
- **গ্রাহকের বিবরণ :**

আমি মাসিক উজ্জীবন পত্রিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক। জানুয়ারি/..... মাস, ২০২৩ থেকে ..... মাস, ২০২৪/২০২৫/২০২৬ পর্যন্ত নির্ধারিত গ্রাহক চাঁদা ..... টাকা প্রদান করলাম।

☞ নাম : _____

☞ পিন নম্বর সহ পুরো ডাক-ঠিকানা : _____

☞ নিকটবর্তী শহর : _____

☞ বর্তমান পেশা বা কর্মজগতের বিবরণ : _____

☞ সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহের বিষয় : _____

☞ হোয়াটসঅ্যাপ সহ মোবাইল নম্বর : _____

তারিখ সহ স্বাক্ষর

কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস ‘কুহেলিকা’ : পুনঃপাঠ

সুমিতা চক্রবর্তী

কবিতা এবং গান রচয়িতা নজরুল ইসলাম এবং সুরকার নজরুল ইসলামকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত কোনওভাবেই ভুলে থাকা যায় না। পত্রিকা-সম্পাদক নজরুল ইসলামকেও রাজনৈতিক পটভূমির কারণে মনে রাখতে হয়েছে আমাদের। কিন্তু কথাসাহিত্যিক নজরুল ইসলামের রচনা-সম্ভার দীর্ঘকাল ছিল সাধারণ পাঠকের কাছে অনেকটাই অপরিচিত। স্বাধীনতা-উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যাজীবীরা নজরুল ইসলামকে কিছুটা উপেক্ষাই করেছিলেন। নজরুল-চর্চা নতুন করে শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর যখন শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে গেলেন তখন থেকে। লেখা হল নজরুল ইসলামের দুটি বিস্তৃত জীবনী।

এক. কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন, রফিকুল ইসলাম, ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রথম প্রকাশ ২০১২

দুই. বিদ্রোহী রণক্লান্ত : নজরুল-জীবনী, গোলাম মুরশিদ, কলকাতা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৮

পশ্চিমবঙ্গেও নজরুল ইসলামের শতবর্ষ অর্থাৎ ১৯৯৮-৯৯ থেকে বিস্তৃতি পেয়েছে নজরুলচর্চা। লেখা হয়েছে নজরুল-জীবনী–

তিন. নজরুল-জীবনী, অরুণকুমার বসু, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ২০০০

চার. সমগ্র নজরুল জীবন, বাঁধন সেনগুপ্ত, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০১৮

তাছাড়াও দুই বাংলা থেকেই প্রকাশিত হয়েছে নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র। তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় না যে, তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি তেমনভাবে পাঠকের কাছে পৌঁছতে পেরেছে। কিন্তু বিশেষ করে নজরুল ইসলামের উপন্যাস তিনটি যদি পড়া যায় তাহলে দেখা যাবে সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর তিনটি উপন্যাসই বিশেষভাবে অনুধাবনের দাবি রাখে। তিনটিই উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। প্রথমটি ‘বাঁধনহারা’, প্রকাশ ১৯২৭। বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুদ্ধ-উপন্যাস। প্রকরণের দিক থেকেও অভিনব। কারণ সমগ্র উপন্যাসটি পত্ররীতিতে রচিত। এই রীতি সেই সময়ের বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও বাংলা সাহিত্যে ছিল অভিনব। যদিও বাংলা সাহিত্যেও তাঁর আগে ‘বসন্তকুমারের পত্র’ নামে নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রেমের উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। বঙ্কিমের ভাষা এবং প্রতাপ-শৈবলিনীর আখ্যানের দুর্বল অনুকরণ এই উপন্যাস। তার সঙ্গে ‘বাঁধনহারা’-র কোনও তুলনাই চলে না।

‘বাঁধনহারা’ যখন প্রকাশিত হল ঠিক সেই সময়েই নজরুল লিখছেন তাঁর পরবর্তী দুটি উপন্যাস প্রায় একই সঙ্গে। ‘মৃত্যুক্ষুধা’ আর ‘কুহেলিকা’-র কাল-পারম্পর্য একটু দেখে নিতে হবে। ‘মৃত্যুক্ষুধা’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আর ‘কুহেলিকা’-র প্রকাশকাল ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস। কিন্তু ‘কুহেলিকা’ ‘মৃত্যুক্ষুধা’-র পরে লিখিত এমন নয়। প্রকৃতপক্ষে ‘কুহেলিকা’-ই আগে প্রকাশিত হতে শুরু করে পত্রিকায়। নওরোজ পত্রিকায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস থেকে প্রকাশ শুরু হয় ‘কুহেলিকা’-র। কিন্তু ‘নওরোজ’ বন্ধ হয়ে গেলে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাস থেকে লেখাটি প্রকাশিত হয় ‘সওগাত’ পত্রিকায় এবং তা তেরোটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়ে সমাপ্ত হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে।

এই নিবন্ধের আলোচ্য উপন্যাস ‘কুহেলিকা’ নজরুল ইসলামের তিনটি উপন্যাসের মধ্যেও পাঠকের সবচেয়ে কম পঠিত। উপন্যাসটিকে প্রথম পাঠে কিছুটা শিথিল মনে হতে পারে। কারও কারও মনে হতে পারে, পরিচ্ছেদগুলির আনুক্রমিক বিন্যাসে স্থির লক্ষ্যের যেন কিছুটা অভাব আছে। উপন্যাসের আখ্যান অংশ একটু বিবৃত করলে পাঠকদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্য হল– ‘‘নারী লইয়া আলোচনা চলিতেছিল’’। স্থান হল ছেলেদের মেসের একটি ঘর। জমায়েত কয়েকজন যুবক।

''এই বাঙলাদেশে গাঁজার চাষ করে গভর্নমেণ্ট তত সুবিধে করতে পারেনি, যত সুবিধে তাদের করে দিয়েছে আমাদের মহাপুরুষেরা আমাদের মস্তিষ্কে ধর্মের চাষ করে...। এই ভেদনীতিই ইংরেজের বুটকে ভারতের বুকে কায়েম করে রাখলে...।''

তরুণ কবি হারুণ, আইনের ছাত্র আমজাদ, নববিবাহিত আশ্‌রাফ--আরও অনেকেই। তাদেরই মধ্যে আছে জাহাঙ্গীর—উপন্যাসের নায়ক। সমগ্র প্রথম পরিচ্ছেদটি—পুরুষ নারীকে কোন্ চোখে দেখতে চায় তারই আলোচনায় পূর্ণ। নারীকে কুহেলিকা বলেছে হারুণ। তারই মধ্যে জাহাঙ্গীর ঘোষণা করেছে— নারী নিতান্তই মানবী। পুরুষ তাকে বহু মিথ্যা স্তুতি দিয়ে দেবী বানাতে চায়। নারীও মোহমুগ্ধ হয়ে সেই ভূমিকায় অভিনয় করে প্রাণপণে। আসলে তাতে নারীর অসম্মানই হয়। জাহাঙ্গীর নারীকে তাই মানবী রূপেই গ্রহণ করে। তাকে বাড়তি সম্ভ্রম ও প্রশস্তির আড়ালে ঢাকা দিতে চায় না। প্রথম পরিচ্ছেদের এই সূত্রপাতে মনে হবে পুরুষের চোখে নারী তথা নারী-পুরুষ সমস্যা নিয়েই এই উপন্যাস গড়ে উঠতে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি খুবই সংক্ষিপ্ত। এখানে জাহাঙ্গীর নামক যুবকটির পারিবারিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কুমিল্লার এক বিখ্যাত জমিদার তার পিতা। তিনি প্রয়াত। তাঁর পত্নী প্রবল দাপটে ও দক্ষতায় জমিদারি চালান। কিন্তু জাহাঙ্গীর জেনেছে যে, তার মা ও বাবা বিবাহিত দম্পতি ছিলেন না। তার মা, একদা বাইজি, তার পিতার সঙ্গে বাস করতেন স্ত্রীর মতোই। যদিও জাহাঙ্গীর-জননী তাঁর বিগত জীবন পরিত্যাগ করেছেন সম্পূর্ণ। জাহাঙ্গীর মা-কে দোষারোপও করেনি। তবু আঘাত সে পেয়েছে ঠিকই। জীবন বিষাদময় তার কাছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পরেও মনে হয়— জাহাঙ্গীরের জীবনই হতে যাচ্ছে এই উপন্যাসের অবলম্বন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে এসে দেখা যায় জাহাঙ্গীরের জীবনের প্রসঙ্গও আসছে উপন্যাসে। কিন্তু সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে বাংলার সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিস্থিতি। স্কুলের ছাত্র থাকবার কালে তরুণ শিক্ষক ও বিপ্লবপন্থী প্রমত্ত-র নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী সংঘে যোগ দেয় জাহাঙ্গীর। তখন বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদান ছিল বিরল ঘটনা। অতিরিক্ত হিন্দুত্ব-প্রবণ আনুষ্ঠানিকতা—গীতা, তিলক, কালীসাধনা, বিবেকানন্দ-অরবিন্দের ভক্তিবাদ ছিল বিপ্লবীদের বিপ্লবচর্যার অঙ্গ। ভারত স্বাধীন হলে তা প্রধানত হিন্দুরই দেশ হবে— একথাটি স্পষ্ট বাচনে উচ্চারিত না হলেও সংশয়ও তেমন ছিল না। অপর পক্ষে মুসলমান সমাজও একই দ্বিধায় আন্দোলিত ছিলেন। ভারতবর্ষ কি সত্যি তাঁদের দেশ? তাঁরা অনেকেই আরব দেশকে স্বদেশ মনে করতেন। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি-সম্পর্কও যেমন অসত্য ছিল না, তেমনই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিরও নিদর্শন ছিল প্রচুর। রাজনীতি সর্বদাই মানুষের ভেদবুদ্ধিকে কাজে লাগায়। বিশ শতকের প্রথম দশকে মুসলিম লিগ-এর উত্থান ভারতীয়দের নিজেদের মধ্যে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভেদভাবনার এক দৃষ্টান্ত।

এই পটভূমি প্রতিফলিত হয়েছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে। পরিচ্ছেদটি বিস্তৃত এবং লক্ষ করি যে, সমগ্র পরিচ্ছেদে নারী নিয়ে কোনও আলোচনাই নেই। তাহলে প্রথম পরিচ্ছেদের সঙ্গে তৃতীয় পরিচ্ছেদের সংযোগটা কোথায়? নিবন্ধের শেষে সেই ভাবনায় আসা যাবে। এখন তৃতীয় পরিচ্ছেদটি দেখে নেওয়া যাক।

মুসলমান জাহাঙ্গীর বিপ্লবী দলে যোগ দিতে চাইলে সাদরে তাকে গ্রহণ করেছে প্রমত্ত ও অন্য যুবকেরা। তৃতীয় পরিচ্ছেদে দীর্ঘ আলোচনায় বারবার ঘোষিত হয়েছে নজরুলের সামাজিক-রাজনৈতিক ও মানবতাবাদী চিত্তের প্রত্যয়। প্রধানত প্রমত্ত-র সংলাপে; কখনও জাহাঙ্গীর ও তার বন্ধু অনিমেষের সংলাপে। আমরা কয়েকটি অংশ উদ্ধার করছি। তাতেই বোঝা যাবে এই উপন্যাসও নজরুল-জীবনেরই আর এক প্রকাশ। তাঁর দেশ-প্রেম-ধারণা সর্বাধিক স্পষ্টতায় এখানেই প্রতিধ্বনিত।

''এই বাঙলাদেশে গাঁজার চাষ করে গভর্নমেণ্ট তত সুবিধে করতে পারেনি, যত সুবিধে তাদের করে দিয়েছে আমাদের মহাপুরুষেরা আমাদের মস্তিষ্কে ধর্মের চাষ করে...। এই ভেদনীতিই ইংরেজের বুটকে ভারতের বুকে কায়েম করে রাখলে...।''

''আমরা অনায়াসে এদেশের মুসলমানদের জয় করতে পারি। তবে তা তরবারি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে। অন্ততঃ একটা স্থূল রকমের শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে ওদের পরিচিত না করে তুললে, 'কালচার'-এর সংস্পর্শে না আনলে ওদের জয় করতে পারব না। ওদের জয় বা স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা মানেই ইংরেজের হাতে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া।''

''মুসলমান জনসাধারণের অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে মোল্লা মৌলবীদের। তাদের রুটি মারা যাবে যাতে করে, তাকে তারা প্রাণপণে বাধা দেবেই। কিন্তু এ ভূতেরও ওঝা আছে– সে হচ্ছে মুসলমান ছাত্রসমাজ। তরুণ মুসলিমকে যদি দলে ভিড়াতে পারি, তা হলে ইংরেজ আর মোল্লা মৌলবী ও দুই জোঁকের মুখেই পড়বে চূণ।''

''মুসলমানেরা যদি হিন্দু রাজ্যের ভয় করেই, তাতে তাদের বড় দোষ দেওয়া চলে না...। মাতৃ-সমিতির অধিনায়কদের মত নাকি হিন্দু রাজেরই প্রতিষ্ঠা। তাদের এ-ভয় আমাদের আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও ত্যাগ দিয়ে দূর করতে হবে। ...ইরান তুরানের দিকে যে ওরা চেয়ে আছে, তাতে ওদের খুব বেশি দোষ দেওয়াও চলে না। দুর্বল মাত্রেই পরমুখাপেক্ষী। নিজেদের শক্তি নেই, ওরা তাই অন্য দেশের মুসলমানদের পানে চেয়ে তাদের শক্তিহীনতার গ্লানিতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে;...''

''মুসলমান জনসাধারণের অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে মোল্লা মৌলবীদের। তাদের রুটি মারা যাবে যাতে করে, তাকে তারা প্রাণপণে বাধা দেবেই। কিন্তু এ ভূতেরও ওঝা আছে– সে হচ্ছে মুসলমান ছাত্রসমাজ। তরুণ মুসলিমকে যদি দলে ভিড়াতে পারি, তা হলে ইংরেজ আর মোল্লা মৌলবী ও দুই জোঁকের মুখেই পড়বে চূণ।''

এই উদ্ধৃতিগুলি নজরুল ইসলামের ভাবনাকে তুলে ধরে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে একটা। এসব সংলাপই বসানো হয়েছে প্রমত্তর মুখে। সে একজন প্রগতিশীল, স্বদেশ-প্রেমিক হিন্দু যুবক। সেই মজলিশে জাহাঙ্গীরও উপস্থিত, কিন্তু তার কোনও কথাই নেই। সে কেবল বিপ্লবী সংগঠনে যোগদানের প্রার্থনাটি জানিয়ে চুপ করে বসে আছে। নজরুল যা ভাবতেন দেশ-ধর্ম-স্বাধীনতা-আন্দোলন বিষয়ে–তা শোনাবার জন্য এই উপন্যাসে কোনও মুসলমান যুবককে বেছে নেননি তিনি। তেমন মুসলমান যুবক সত্যিই দেশে কম ছিলেন বলেই কি? নজরুল হিন্দু-মুসলমান-ব্রিটিশ বিষয়ে যা ভেবেছিলেন তার সমকণ্ঠ ও সমভাষ্য কোনও কোনও হিন্দুর মধ্যেই শুনেছিলেন প্রধানত। জাহাঙ্গীর এর পর হৃদয়-মন ঢেলে দিয়ে দেশের কাজ করেছে। তার কাজেই তার পরিচয়; কিন্তু দেশ ও ধর্ম বিষয়ে তার মতামত কোথাও ব্যক্ত হয়নি।

'কুহেলিকা' উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ বাক্যটি হল– ''ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়– এ আমার মানুষের– মহা-মানুষের মহাভারত।''

তৃতীয় পরিচ্ছেদের এই সব দীর্ঘ আলোচনা উপন্যাসটিকে এক বিশেষ মাত্রা দিয়েছে– যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'ডিসকোর্স নভেল'। যেখানে উপন্যাসের ঘটনা-নির্ভর প্লট গঠনের সংবদ্ধতা কিছুটা উপেক্ষা করে কোনও একটি ভাবনা বা তত্ত্বকে নিয়ে বিভিন্ন জনের অভিমত উপস্থাপিত করা হয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদের আকারই হল যেন একটি আলোচনা সভার। প্রমত্ত প্রধান বক্তা হলেও মত প্রকাশ করেছে আরও কেউ কেউ। ডিসকোর্স-এর বিষয় হল ভারতের স্বাধীনতা -সংগ্রামে হিন্দু ও মুসলমানের অবস্থান নির্ণয়।

কিন্তু তৃতীয় পরিচ্ছেদের পর এই বহুমুখী আলোচনা উপন্যাসটিতে আর সম্প্রসারিত হয়নি। এজন্যই উপন্যাসটিকে শিথিল-গঠন মনে করা অস্বাভাবিক নয়।

অতঃপর উপন্যাস জাহাঙ্গীরকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হয়। তার উচ্ছ্বাস, আন্তরিক দেশপ্রেম, সৌন্দর্যমুগ্ধতা, বেহিসাবি খামখেয়াল। বন্ধুরা তাকে 'পাগল গাজী' বলে ডাকে। নজরুলের ব্যক্তিচরিত্রই যেন ফুটে ওঠে চোখের সামনে। বিপ্লবী সংগঠনের কাজের জন্য তাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। ক্রমে দেশপ্রেমের সঙ্গে তার জীবনে জড়িয়ে যেতে থাকে নারী।

নজরুলের জীবন অনুসরণ করলে লক্ষ করতেই হবে

যে, নারীর প্রতি তাঁর মনের বিশেষ একটা টান ছিল। উদাসীনতা একেবারেই ছিল না। স্বভাব-রোমান্টিক ছিলেন তিনি। 'সুন্দর' তাঁকে আবেশমুগ্ধ করে দিত। নারীর মধ্যে সেই সুন্দরকে তিনি অহরহই প্রত্যক্ষ করতেন। বিশ শতকের প্রথম তিন-চার দশকে বাংলার সমাজ-জীবনে নারী-পুরুষের মেলামেশা একেবারেই সহজ ছিল না। তরুণ-তরুণীদের মেলামেশা ছিল খুবই ব্যতিক্রম। ফলে কল্পনাপ্রবণ ও রোমান্টিক মনের মানুষদের কাছে নারী ছিল এক আলাদা আকর্ষণ। নজরুল সেই আকর্ষণে বারবার ধরা দিয়েছেন। এ-জন্য তাঁকে বিবিধ সমস্যায়ও পড়তে হয়েছে। প্রথম বিবাহ-ব্যাপারের জটিলতা কাটিয়ে উঠে যখন তিনি রীতিমতো সংসারী তখন গ্রামোফোন কোম্পানির সূত্রে তাঁর প্রবল জনপ্রিয়তা। গীতিকার ও সুরকার হিসেবে তিনি তুমুল বিখ্যাত। সুকণ্ঠ গায়ক, আকর্ষক রূপ, খোলা আচরণ তাঁর। সংগীত-শিক্ষক রূপেও বহুজন-সান্নিধ্যে তিনি পূর্ণ। চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁর সংযোগ। আবার সাহিত্যিক বলেও তাঁর বিপুল খ্যাতি। বহু নারীর সংসর্গেই আসতেন। বিদুষী, গায়িকা, অভিনেত্রী তাঁরা। দু-পক্ষেই আকর্ষণ জেগে ওঠবার সম্ভাবনা দেখা দিত। সামাজিক পরিস্থিতি যেখানে সামান্য শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেবার মতো, সেখানেই জড়িয়ে পড়তেন কেউ কেউ। নজরুলের দুটি উপন্যাসের দুই নায়কের জীবনেই দুজন করে প্রেমিকার উপস্থিতি। 'বাঁধনহারা'-য় মাহবুবা ও সোফিয়া; 'কুহেলিকা'-তে তহমিনা ও চম্পা।

তাহলে কি এই উপন্যাসেই আমরা নজরুল ইসলামের আত্মজীবনীরও সন্ধান করব? সব উপন্যাসেই লেখকের আত্মজীবন, নিজস্ব চিত্ত-মননের অভিক্ষেপণ থাকে। কিন্তু যে-উপন্যাস পাঠকালে পাঠকের মনে বার বার ভেসে ওঠে আখ্যান-কথকের জীবনের সঙ্গে ঘটনা-সাদৃশ্যের একাধিক প্রসঙ্গ, সে উপন্যাসকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের লক্ষণ - চিহ্নিত অবশ্যই বলা যায়।

বন্ধুর বোন তহমিনার সঙ্গে প্রথম আলাপ ও মুগ্ধতার চিত্ররূপে তাঁর প্রথম বিবাহের (বিবাহ সম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে) পাত্রী নার্গিসের সঙ্গে পরিচয়ের অভিজ্ঞতা-চিহ্ন আছে। তহমিনার সঙ্গে পরিচয়ের পরিণামে জাহাঙ্গীর ও তহমিনা দেহে-মনে মিলিত হয়। কিন্তু সংকট খুব একটা ঘটে না কারণ জাহাঙ্গীরের মা ফিরদৌস বেগম পুত্রবধূকে সাদরে বরণ করতে প্রস্তুত। সংকট আসে অন্যদিক থেকে। চম্পা নামের এক দেশকর্মিণী তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হয় জাহাঙ্গীরের। সে হিন্দু। নজরুলের দ্বিতীয় বিবাহের পাত্রী হিন্দু-কন্যার কথা মনে পড়বে। এই উপন্যাস লেখার কালে নজরুলের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে (১৯২২)। চম্পার মা জয়তীর সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের চিত্তের যে সসম্ভ্রম শ্রদ্ধার পরিচয় উপন্যাসে আছে তা প্রমীলা দেবীর জননী গিরিবালা ও পিতৃব্যপত্নী বিরজাসুন্দরী দেবীর প্রতি নজরুলের শ্রদ্ধার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। চম্পাকেও নির্দ্বিধায় ভালোবেসেছে জাহাঙ্গীর। দেশপ্রেমের সমবন্ধনে বাঁধা তাদের প্রাণ। তহমিনা সেখানে তার প্রকৃত সঙ্গিনী নয়। চম্পার সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সম্পর্ক নিয়ে চম্পা বা জাহাঙ্গীর কেউই বিশেষ চিন্তা করেনি। কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়েছেন ফিরদৌস বেগম, কাতর হয়েছে তহমিনা।

এখানে আর একটি প্রশ্নেরও মুখোমুখি হতে পারি আমরা। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্কও মনে রাখতে হবে। একদা বাইজি সেই নারী, বিগত জীবন পরিত্যাগ করে জাহাঙ্গীরের পিতার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতোই বসবাস করতেন। জাহাঙ্গীর তার জন্য কাউকে দোষারোপ করেনি। কিন্তু মনের মধ্যে সে-জন্য আছে বিষাদ। দূরাগতভাবে নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর মায়ের সম্পর্ক স্মরণ করা যেতে পারে। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে মায়ের সঙ্গে তিনি আর সম্পর্ক রাখেননি। তার কারণ কী? কেউ কেউ বলেন স্বামীর ভাই বজলে করিম-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। বিধবাবিবাহ ইসলাম ধর্মে কেবল সমর্থিত নয়, তা সৎকর্ম বলে বিবেচিত। কিন্তু নজরুলের মাতৃ-ভাবনার বৃত্তে এই বিধি কোনও ভাবেই সহনীয় হয়নি। তার চেয়েও বড়ো কথা অধিকাংশেরই মতে তাঁর জননী পুনর্বিবাহ করেননি। তাহলে নজরুলের বিরাগ কেন?

এ-বিষয়ে ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে যা জেনেছি তা জ্ঞাপন করি। এই তথ্য আমাকে জানিয়েছেন নজরুলের পুত্রবধূ, কাজী অনিরুদ্ধের পত্নী শ্রীমতী কল্যাণী কাজী। কল্যাণী কাজী-র স্বভাব অত্যন্ত খোলামেলা। মন স্বচ্ছ ও উদার। কোনও গোপনীয়তা না রেখেই তিনি আমাকে বলেছেন—বিবাহ হয়নি। কিন্তু প্রয়াত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অভাবের সংসারে অন্যতম সহায়ক ছিলেন বজলে করিম। তাই নিয়ে চুরুলিয়া গ্রামে কিছু গুঞ্জন ছিল, যাকে ইংরেজিতে বলে 'গসিপ্'। এইটুকুতেই কিন্তু বিচলিত হয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। তিনি অতিমাত্রায় ভাবাবেগ- প্রবণ ছিলেন; তাঁর মন উদার হলেও হৃদয়াবেগের প্রাবল্য ছিল বেশি। ঠিক যুক্তিবাদী তাঁকে বলতে পারি না।

ফিরে আসি উপন্যাসে।

এই প্রেম-কাহিনি-ধারার পাশাপাশি জাহাঙ্গীরের দেশাত্মবোধক কার্যক্রম চলতে থাকে। উপন্যাসের শেষে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বন্দি হয় জাহাঙ্গীর ও তার সঙ্গীরা। পুলিশের খাতায় জাহাঙ্গীরের নাম কিন্তু স্বদেশকুমার। বিপ্লবীদের ছদ্মনাম নিতে হত। কিন্তু বাংলা শব্দের নামকরণ বাঙালি মুসলমানের মধ্যে এখনও বেশি প্রচলিত নয়। তখন আরও কম ছিল। মুসলমানের এই নামকরণ নজরুলই করতে পারতেন। যিনি পুত্রদের নাম দিয়েছিলেন সব্যসাচী আর অনিরুদ্ধ।

উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে দেশপ্রেমের প্রবলতর স্রোতে নর-নারী-প্রেমের ক্ষুদ্রতর সংকটগুলি ভেসে গেছে। জাহাঙ্গীর তার সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ দেয় তহমিনাকে। বাকি রেখে যায় চম্পার তত্ত্বাবধানে—দেশের সেবার জন্য। তার মা তীর্থবাসিনী হবেন।

উপন্যাসটি সম্পর্কে শৈথিল্যের অভিযোগ যাঁরা তোলেন তাঁদের যুক্তি এই—দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধ ও দেশপ্রেম বিষয়টির সঙ্গে জাহাঙ্গীরের জীবনে দুই নারীর আবির্ভাব-সংকট—এই অপর বিষয়টিও প্রাধান্য পাবার ফলে উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি বিচলিত হয়েছে। কিন্তু যদি আমরা অন্য দিক থেকে দেখি—উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে প্রেম বা দেশপ্রেম নয়; আছে এক ব্যক্তি-নায়ক জাহাঙ্গীর। তার মনোপ্রচ্ছায় নিয়েই এই উপন্যাস। জননী আর জন্মভূমি—দুইই তার; প্রেম ও দেশপ্রেম—এই দুইও তার, এভাবে দেখলে কিন্তু উপন্যাস-প্লট আর শিথিল লাগে না। জাহাঙ্গীরকে পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র দিতে গেলে এই জাতীয় বিন্যাসই প্রয়োজন ছিল।

নজরুল-মানসের প্রতিবিম্ব রূপে 'কুহেলিকা' উপন্যাসটি স্মরণীয়। নজরুলের স্বদেশ-প্রেম, হিন্দু-মুসলমান-সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর মনোভাব আর নারী সম্পর্কে তাঁর মানস-প্রবণতা—একসঙ্গে অনুভব করা যায় এই উপন্যাসে। নজরুলের উপন্যাসের আত্মজৈবনিক লক্ষণের দিক থেকেও তাই লেখাটি জরুরি। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি সর্বদাই নিজেদের ভেবেছে 'মানুষ'— হিন্দু বা মুসলমান নয়। শেষ পর্যন্তও অবশ্য প্রশ্ন থেকে যায়, উপন্যাসটির নাম কেন 'কুহেলিকা'? নারী কুহেলিকার মতো— এরকম একটি কথা উপন্যাসের শুরুতে বলেছিল জাহাঙ্গীরের কবি-বন্ধু হারুণ! উপন্যাসের শেষে সেই উক্তি পুনরাবৃত্ত হয়েছে জাহাঙ্গীরের কণ্ঠে। কারার অন্তরালে চলে যাবার সময়ে সে হারুণকে হেসে বলে গেছে— ''তোমার কথাই সত্য হল কবি, নারী 'কুহেলিকা'।'' কিন্তু এ-উক্তি এক আত্মতৃপ্ত পুরুষের। যার সংকটকালে তার জননী ও দুই প্রণয়িনী সকলেই সর্বস্বার্থ পরিত্যাগ করে তার মঙ্গলকামনায় আত্মনিবেদিত। কেন যে

কারার অন্তরালে চলে যাবার সময়ে সে হারুণকে হেসে বলে গেছে— ''তোমার কথাই সত্য হল কবি, নারী 'কুহেলিকা'।'' কিন্তু এ-উক্তি এক আত্মতৃপ্ত পুরুষের। যার সংকটকালে তার জননী ও দুই প্রণয়িনী সকলেই সর্বস্বার্থ পরিত্যাগ করে তার মঙ্গলকামনায় আত্মনিবেদিত। কেন যে

মেয়েরা এত ভালোবাসে তাকে— এমন একটি উত্তরই যেন অনুক্ত আছে ঐ বাক্যে। 'কুহেলিকা'-র নারীরা সকলেই জাহাঙ্গীরের জন্য সব দিতে পারে— এই হল তাদের কুহেলিকাত্বের স্বরূপ। এর মধ্যেও আমরা নজরুল-ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র-নিহিত এক কিশোর-স্বভাব যেন চিনে নিতে পারি।

'কুহেলিকা' উপন্যাসটি সাধু বাংলায় লেখা। পূর্ববর্তী 'বাঁধনহারা' উপন্যাসটি চিঠিতে গড়ে তোলা বলে সাধুভাষা প্রয়োগের সুযোগ ছিল না। 'মৃত্যুক্ষুধা' চলিত ভাষায় লিখেছিলেন নজরুল। 'কুহেলিকা' উপন্যাসে সাধু ভাষা প্রয়োগের নির্দিষ্ট কারণ কিছু বলা কঠিন। ভাষা নিয়ে নজরুল সর্বদাই পরীক্ষা করতেন তাঁর নিজের মতো করে। এই উপন্যাসের সাধুভাষা তারই দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব। সংলাপে আগাগোড়াই চলিত ভাষা ব্যবহৃত।

'কুহেলিকা' উপন্যাসটি সম্পর্কে সাধারণভাবে একটি অভিযোগ তোলা হয়—তা হল উপন্যাসটির কাহিনি নির্মাণ অর্থাৎ প্লট গঠনের ক্ষেত্রে সংহতি এবং ঘটনার যৌক্তিক সংস্থানের শর্ত মান্য করা হয়নি। যখন উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে তখন উপন্যাসের প্লট-ধারণার যে বৈশিষ্ট্য সমূহ স্বীকৃত ছিল তার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে ই. এম. ফর্স্টার-এর ১৯২৭-এ

প্রকাশিত 'অ্যাসপেক্ট্স্ অব দ্য নভেল' গ্রন্থের উপন্যাস তত্ত্বের। ফস্টার-এর গ্রন্থ প্রকাশের অনেক আগে থেকেই বিশ্বে বহু উপন্যাস লেখা হয়ে গেছে। সেই লেখকেরা ফস্টার-এর বই পড়ে উপন্যাস লেখেননি। নজরুলও নয়। কিন্তু সাহিত্যের আলোচকেরা উপন্যাসের প্লট-বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন ফস্টার-এর তত্ত্ব দিয়ে। সেই তত্ত্বের মূল কথাটি ছিল—একটি উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনা তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে অপরিহার্য যৌক্তিকতায় অন্বিত থাকবে। সেই সঙ্গে এমনও মনে করা হত, আখ্যানের মূল ধারার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয় এমন কোনও অংশ উপন্যাসে প্রাধান্য পাবে না। এমনও প্রত্যাশিত ছিল যে, প্রতিটি আখ্যানে থাকবে পঞ্চ-পর্যায়বিশিষ্ট একটি অবয়ব। সেই পঞ্চ পর্যায় হল—আখ্যানের সূত্রপাত, ঘটনার আরোহণ, শীর্ষ-ঘটনা, ঘটনার অবরোহণ এবং পরিণাম। পশ্চিমি পরিভাষায় এই পঞ্চসন্ধিকে বলা হয়—এক্সপোজিশন, রাইজিং অ্যাকশন, ক্লাইম্যাক্স, ফলিং অ্যাকশন এবং কনক্লুজন। এই তাত্ত্বিক ধারণ অনুসারে বিশ শতকের মধ্যভাগে উপন্যাসের প্লট-গঠন বিশ্লেষিত হয়েছে সর্বত্র—বিদেশে ও এদেশে। বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্রুকুমার সিকদার; তারও আগে গোপাল হালদার প্রমুখ আলোচক এই সংস্কারকে সামনে রেখে উপন্যাস-প্লট-এর ভালোমন্দ নির্ধারণ করেছেন।

কিন্তু শিল্পীর সৃষ্টি কখনও তত্ত্বকে অনুসরণ করে চলেনি; তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় শিল্পের অনুসরণে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকাল থেকেই পাশ্চাত্য সাহিত্যে এক ধরনের উপন্যাস রচিত হতে শুরু করেছিল যেগুলি ফর্স্টার নির্দেশিত উপন্যাস-তত্ত্বের আওতার মধ্যে পড়ে না। অবশ্য তখন ফর্স্টার-এর বই প্রকাশিতও হয়নি। সেই সব উপন্যাসের মধ্যে বিশিষ্ট হল মার্সেল প্রুস্ত (১৮৭১-১৯২২) এর লেখা সাত খণ্ডের উপন্যাসমালা, যার সম্পূর্ণ অভিধার বাংলা অনুবাদ হতে পারে 'বিগত সময়ের সন্ধানে'। প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৯১৩ তে, শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯২২-এ। এই উপন্যাস চেতন ও অবচেতন স্তরের অনুভব-মিশ্রিত মনোপ্রবাহের তাৎক্ষণিক অনুসরণের পদ্ধতিতে লিখিত। প্রত্যাশিত প্লট-এর পঞ্চ পর্যায়ের কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না এই উপন্যাস-মালায়। এভাবেই উপন্যাস লিখেছিলেন ডরোথি রিচার্ডসন (১৮৭৩-১৯৫৭), ভার্জিনিয়া উল্ফ্ (১৮৮২-১৯৪১) এবং জেমস্ জয়েস (১৮৮২-১৯৪১)। এই লেখকদের রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে, বিশেষ করে জয়েস-এর 'ইউলিসিস' (১৯২২) এক বিশ্ববিশ্রুত উদাহরণ।

এই চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসগুলির পশ্চাদ্‌পটরূপে মনে রাখতে হবে ১৮৯০-এ প্রকাশিত মনস্তত্ত্ববিদ্ ও দর্শনবিদ্ উইলিয়াম জেম্স্ (১৮৪২-১৯১০) এর 'দ্য প্রিন্সিপ্ল্স্ অব সাইকোলজি' গ্রন্থটি। 'স্ট্রিম অব কনশাসনেস' বা 'চেতনাপ্রবাহ' শব্দবন্ধের তিনিই স্রষ্টা। আর এক জন ছিলেন জার্মান চিকিৎসক ও মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)। তাঁর পরেই এসেছিলেন আরও অনেকে। এই মনোবিজ্ঞানীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষের মনের গোপন অন্দরমহলটিকে খুলে দেখানো; মানুষের একান্ত নিজস্ব আত্মসত্তার রহস্যলোককে অনুভব করা। এই চিন্তনভূমির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হল প্রুস্ত, রিচার্ডসন, জয়েস, উলফ্-এর উপন্যাস। তাঁদের লেখায় ফর্স্টার-এর তত্ত্বের কোনও প্রভাবই নেই। যখন এই লেখকেরা লিখতে শুরু করেছেন ফর্স্টার-এর বই তখনও প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু বিদ্যায়তন-নিষ্ঠ অধ্যাপকেরা ফর্স্টার এর অনুসরণে ১৯২৭-এর পর থেকে উপন্যাসের আলোচনা করে চললেন দীর্ঘকাল।

নতুন প্রজন্মের আলোচকেরা দেখা দিলেন বিশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময় থেকে। তাঁদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কথাসাহিত্য বিশ্লেষণ উপন্যাসের প্লট-ধারণার ভিন্ন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এখন আখ্যানকে গ্রহণ করা হচ্ছে 'ন্যারেটিভ' অর্থাৎ কথিত অবয়বরূপে। এখনকার এই তত্ত্বের নাম 'ন্যারেটোলজি'। অনেক আলোচকের নামই করা যায়।

রলাঁ বার্থ (১৯১৫-১৯৮০)-এর নাম প্রথমেই মনে পড়ে। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ যার ইংরেজি অনুবাদের নাম হল 'অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যানালিসিস অব ন্যারেটিভ'। সেই প্রবন্ধের প্রথম বাক্যটিই ছিল— "ThEre are countless forms of narrative in the world." (New Literary History, vol. 6 winter 1975, Tr. by Richard Miller)। বার্থ- এর মতে বিশ্বের সর্বত্র, সব সমাজে এবং সর্ব সময়ে আখ্যানের প্রচলন আছে। এই সিদ্ধান্তে তেমন কোনও চমক নেই। কিন্তু তার পর 'লেখকের মৃত্যু' প্রবন্ধে তিনি ঘোষণা করেন যে, লেখকের মৃত্যু হয়েছে; জন্ম হয়েছে পাঠকের। তাঁর বলবার কথাটি হল, একটি আখ্যান কথিত হবার পর কথকের আর কোনও ভূমিকা থাকে না। প্রত্যেক শ্রোতা ও পাঠকের কাছে সেই আখ্যান ভিন্ন ভিন্ন

তাৎপর্যে প্রতিভাত হয়। কাজেই শ্রোতা বা পাঠক যেভাবে আখ্যানটিকে গ্রহণ করবেন তাঁর কাছে তা-ই হল সেই আখ্যানের স্বরূপ।

এই দিক থেকে দেখলে ফর্স্টার এর উপন্যাস-তত্ত্বের বিশেষ কোনও গুরুত্ব আর থাকে না। একটি উপন্যাসের প্লট সম্পূর্ণভাবেই শ্রোতা বা পাঠকের মনের দিক থেকে গৃহীত হয়। কোনও তত্ত্ববিদের নির্দেশ করে দেওয়া ছক সেখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বিশ শতকের শেষ তিন দশক থেকে শুরু করে উপন্যাসের আখ্যান-তত্ত্বের এই পর্বান্তর ক্রমেই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। এই সময়ের আর একজন উল্লেখযোগ্য আখ্যান-তত্ত্ববিদ্ জেরার্ড জেনেট (১৯৩০-২০১৮) এর একটি উদ্ধৃতি দেখা যেতে পারে।

"...analysis of narrative discourse as I understand it constantly implies a study of relationships : on the one hand the relationship between a discourse and the events that it recounts [...], on the other hand the relationship between the same discourse and the act that produces it, Narrative Discourse: An Essay in Method, Cornell University Press,Ithaca of New York, P-1983, 26-27"

এই উদ্ধৃতিতে জেরার্ড যে রিলেশনশিপ এর কথা বলেছেন তা হল আখ্যানের শ্রোতা বা পাঠকের কাছে আখ্যানের ক্রিয়া এবং ডিসকোর্স-এর সম্পর্ক যেভাবে গাঁথা হয়েছে সে সম্পর্কে শ্রোতা/পাঠকের উপলব্ধি। কথক কী ভেবেছেন—সে প্রশ্ন এখানে উঠবে না। এই দিক থেকে দেখলে 'কুহেলিকা' উপন্যাসে জাহাঙ্গীর-তহমিনা- চম্পা সংক্রান্ত ঘটনাবলি এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্বাধীনতা-আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সংগ্রাম সম্পর্কিত আলোচনাটি কখনওই শিথিলবদ্ধ বলে মনে হবে না। জাহাঙ্গীরের জীবনের সঙ্গে, উপন্যাসের রচনাকালের সঙ্গে, দেশের ইতিহাসের সঙ্গে এই অংশটির বন্ধন তাৎপর্যময় রূপে উদ্ভাসিত হবে। সবটাই দেখতে হবে জাহাঙ্গীরের জীবনের ও ভাবনার অংশ রূপে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফর্স্টার-এর আগে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল আর এক ইংরেজ তত্ত্ববিদের গ্রন্থ 'দ্য ক্রাফ্ট্ অব ফিকশন'। তাঁর নাম পার্সি লাবক (১৮৭৯-১৯৬৫) তিনি কিন্তু তাঁর গ্রন্থে আখ্যানের কথকের সঙ্গে শ্রোতার সম্পর্কটিকে মুক্ত দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। তাঁর গ্রন্থটি তুলনামূলকভাবে কম পঠিত, কিন্তু সেখান থেকে দুটি অংশ উদ্ধৃত করা সমীচীন। এক জায়গায় লাবক স্পষ্টই বলেছেন—

One critic condemns a novel as "shapeless", meaning that its shape is objectionable; another retorts that if the novel has other fine qualities, its shape is unimportant; and the two will continue their controversy till an onlooker, pardonably biwildered, may begin to suppose that "form" in fiction is something to be put in or left out of a novel according to the taste of the author. (The craft of Fiction Jonatha Cape, London, 1921, P-14-15)

তাঁর বক্তব্য খুবই স্পষ্ট— একটি উপন্যাসের গঠন তথা প্লট বিভিন্ন আলোচকের কাছে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে লাবক যা বলেছেন তা যেন রলাঁ বার্থ-এর বক্তব্যের অভ্রান্ত পূর্বাভাস।

The reader of a novel by which I mean the critical reader--is himself a novelist; he is the maker of a book which may or may not please his taste when it is finished, but of a book for which he must take his own share of the responsibility. The author does his par, but he cannot transfer his book like a bubble into the brain of the critic; he cannot make sure that the critic will process his work. The reader must therefore become, for his part, a novelist, never permitting himself to suppose that the creation of the book is solely the affair of the author. (ibid,P 17-18)

উপন্যাসের পাঠক যে উপন্যাসটিকে পুনর্নির্মাণ করবেন নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সেকথা এখানেই বলে দিয়েছেন লাবক। নজরুল ইসলামের 'কুহেলিকা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে—লাবক-এর গ্রন্থ প্রকাশের দশ বছর পরে। সম্ভবত নজরুল লাবক-এর তত্ত্ব সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির জগতে সারসত্য একথাই—আগে গড়ে ওঠে শিল্প; তার পর তাকে অনুসরণ করে তত্ত্ব। তত্ত্বের মুখ চেয়ে কখনও শিল্পের সৃষ্টি হয় না। একটি উপন্যাস যখন লেখা হয়েছে, তারপর থেকে যতবার তার বিচার করেছেন আলোচকেরা ততবারই সেই বিচার নতুন নতুন উপলব্ধিকে তুলে এনেছে প্রত্যেক আলোচকের মনে।

কোনও উপন্যাসের বিচার কোনওদিন শেষ কথারূপে পরিগণিত হতে পারে না। আমাদের অনেকের কাছেই 'কুহেলিকা' উপন্যাসটি প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক 'ডিসকোর্স' তথা বহুমুখী আখ্যানরূপে গণ্য হয়।

মৃত্যুক্ষুধা : সামাজিক বাস্তবতার অনন্য নির্মাণ

এ টি এম সাহাদাতুল্লা

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে পরিচিত ও সম্মানিত কবি হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ তখন মধ্য গগনে। ঝড়ের গতিতে এক নতুন সুরের বীণা বাজিয়ে সাহিত্যের অঙ্গনে পা রেখেছিলেন এই কবি। প্রথম সাক্ষাতেই লুঠ করে নিয়েছিলেন পাঠক-সাধারণের সমর্থন। তাঁর কবিতায় বিদ্রোহ ও বিপ্লবের যে সুর উচ্চারিত হয়েছিল পরাধীন দেশের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তার এক নতুন ভাষ্য। সময়ের পরিবর্তনে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ঘুচে গেছে পরাধীনতার বন্ধন। অসাম্য, শোষণ বঞ্চনার কিন্তু অবসান হয়নি। বিদ্রোহী কবি নজরুল তাই স্বাধীনতা উত্তরকালেও আর এক পরিচয়ে সজীব আছেন। আমাদের সমাজে অসাম্যের অন্ধকার যতদিন বজায় থাকবে ততদিন তিনি প্রবলভাবে টিকে থাকবেন, অনেক কাব্যবোদ্ধার সরব বা নীরব অসমর্থন সত্ত্বেও। সে অন্য কথা। আমাদের আলোচ্য ঔপন্যাসিক নজরুল ও তাঁর মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসটি।

একই সঙ্গে অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যানের যে ভার একদা নজরুলকে বহন করতে হয়েছিল তাঁর সমকালের অন্য কোনো কবি-সাহিত্যিকের সে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়নি। কেন এই প্রত্যাখ্যান। শৈল্পিক একটা ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে। এক বিশেষ মানদণ্ডে বিচার করলে নজরুল কখনো কখনো সত্যিই খুব হালকা হয়ে যান। কিন্তু সে তো নিছক শিল্পের মাপকাঠিতে। জীবনশিল্পী হিসাবে তাঁকে অস্বীকার করার সত্যিই কী কোনো জায়গা আছে! সম্ভবত নেই। অথচ অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছে, একবার নয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি থেকে নির্বাসিত হয়েছেন কবি নজরুল। সেও অন্য ইতিহাস। আমরা আবারও আমাদের জায়গা থেকে সরে এলাম।

কবি নজরুল পাঠকের থেকে ভালোবাসা পেয়েছেন, নিন্দা মন্দও কুড়িয়েছেন। সবমিলিয়ে যে পরিচিতি তিনি অর্জন করেছিলেন ওপন্যাসিক নজরুলের অবস্থান তার থেকে বহু দূরে। ঔপন্যাসিক নজরুল এক উপেক্ষিত ব্যক্তিত্ব। সবচেয়ে মজার বিষয় কাব্যকার নজরুল যে কারণে অস্বীকৃত হয়েছেন সমালোচকের কলমে, ঔপন্যানিক নজরুল তাঁর বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েও সেই অস্বীকারের সীমা অতিক্রম করতে পারলেন না। নজরুল বিশেষ এক সময়ের কবি, তাঁর কবিতায় চিরন্তনত্বের ছাপ নেই, অভিযোগের ধরণ এমনই। ঔপন্যাসিক নজরুলের মধ্যে চিরন্তনত্বের ছাপ আছে, বিশেষত তাঁর মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসটিতে। দুঃখের বিষয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকাররা কখনোই নজরুলের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিভার এই দিকটিকে খতিয়ে দেখেননি। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রভৃতিতে কথাকার নজরুলের জায়গা হয়নি। ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-এ নজরুলের জন্য একটা আসন ছেড়ে দিয়েছেন। পদক্ষেপটা ইতিবাচক। এই প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জরুরি। ঔপন্যাসিক নজরুলকে নিয়ে আরও অনেক কথা হওয়া দরকার। আমরা বাংলা সাহিত্যের এই অকর্ষিত প্রায় ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছি অনেক সীমাবদ্ধতা সহ। কথাকার বা ঔপন্যাসিক নজরুলের সামগ্রিক মূল্যায়ন আমাদের লক্ষ নয়। আমরা এবারের মতো সীমায়িত থাকব মৃত্যুক্ষুধা-র সীমানায়।

২

বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়েছিল বঙ্কিমের হাত ধরে। ইতিহাস আশ্রিত রোমান্স রচনার অসামান্য কারিগর বঙ্কিম সামাজিক দায়বদ্ধতার তাড়ন থেকে মাঝেমধ্যে সামাজিক উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন। তাঁর বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল সামজিক উপন্যাস হিসাবে বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় সংযোজন। কিন্তু উপন্যাস দুটি সর্বাঙ্গসুন্দর নয়। সামাজিক উপন্যাস হিসাবে এখানে রয়েছে এক মস্ত ফাঁকির দিক। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের চলার পথের দু'ধারে ভিড় করে ছিল যে সব সাধারণ মানুষ তিনি তাদের দিকে ফিরেও তাকাননি। তাদের ছায়ামাত্র নেই তাঁর উপন্যাসে। সামাজিকতার পথে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের চলার পথের দৈর্ঘ এমনিতে কম নয়। চোখের বালি থেকে শুরু করে চার অধ্যায় সব জায়গাতেই সামাজিক মানুষ কমবেশি জায়গা পেয়েছে। কিন্তু তারপরেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। বঙ্কিমের অপূর্ণতা

ছায়াপাত করলো রবীন্দ্র-উপন্যাসের অঙ্গনেও। সাধারণ মানুষের দেখা নেই। গোরা-য়(১৯১০) ফরু সর্দাররা এরা একবার মুখ দেখিয়েই অন্তর্হিত হল। ১৯১০ থেকে ১৯৩৪ দীর্ঘ্য এই সময়ের মাঝে সাধারণ মানুষ আর একবারও মুখ দেখানোর সুযোগ পেল না রবীন্দ্র-উপন্যাসে। পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হয় শরৎচন্দ্রে এসে। সাধারণ মানুষ ভিড় করে এল তাঁর রচনায়। কিন্তু যে অপূর্ণতা নিয়ে আমরা মাথা ব্যথা করছি সে দিকের বিশেষ কিছু হল না। এক নির্দিষ্ট পরিসরের বাইরে পা রাখলেন না ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র। নর-নারীর প্রেম সম্পর্কের ঘাত প্রতিঘাত, বাঙালি মেয়েদের জীবনের নানা জটিলতা প্রভৃতির বাইরে তাঁর পথচলা তেমন স্বচ্ছন্দ নয়। গভীর জীবন বাস্তবতার রূপায়ণ বলতে আমরা যা বুঝি তাঁর অবস্থান সেখান থেকে বহু দূরে। বাংলা উপন্যাস তাই শরৎচন্দ্র পর্বেও বাস্তব ভিত্তি পায়নি। একটা সম্ভাবনার জায়গা তৈরি হয়েছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর স্বর্ণলতা-কে ঘিরে। কিন্তু সে সম্ভবানাও অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। উত্তর স্বর্ণলতা পর্বের তারকনাথ ডুব দিয়েছেন পরিচিত রোমান্টিক পরিমণ্ডলের গভীরে। বাস্তবতার সেই স্পন্দন আর তাঁর মধ্যে তেমনভাবে ফুটে ওঠেনি। নজরুল সেদিনের বাংলা সাহিত্যের এই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করছিলেন বিশেষ করে। তাঁর মৃত্যুক্ষুধা জীবন বাস্তবতার আগুনে তপ্ত এক অঙ্গার।

৩

নবাব আলীবর্দি খাঁর সময় থেকেই সমস্যাটা শুরু হয়েছিল। সুজলা, সুফলা বলে খ্যাত যে বাংলাদেশ তার অধিবাসীরা দু'বেলা দু মুঠো ভাত খেতে পাচ্ছিল না। সমস্যা চরম আকার ধারণ করে উত্তর পলাশির যুদ্ধ পর্বে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সীমাহীন শোষণের হাত ধরে পথের ভিখারিতে পরিণত হয় প্রায় গোটা জাতি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দিনে মারা পড়ে দেশের এক তৃতীয়াংশ প্রায় মানুষ। মন্বন্তরের ভয়াল দিনগুলি কোনোক্রমে একসময় পেরিয়ে আসা যায়, কিন্তু অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় না। অন্নের জন্য হাহাকার চলতেই থাকে। বুভুক্ষু মানুষের এই হাহাকারকেই নজরুল উপজীব্য করেছেন তাঁর উপন্যাসের। দেখিয়েছেন ক্ষুধার লেলিহান শিখায় কীভাবে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় ব্যক্তি মানুষ, তার পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন।

মৃত্যুক্ষুধা-র কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি দরিদ্র মুসলমান পরিবার। পরিবারের প্রধান এক বৃদ্ধা। তার তিন ছেলের মধ্যে

সারাদিন কাজ করে প্যাকালে যা পয়সা পায় তাই দিয়ে সন্ধ্যায় বাজার করে আনে। রান্না হয় গোটা পরিবারের মুখে অন্ন ওঠে। যেদিন আয় রোজগারের কোনো পথ খুঁজে পায় না প্যাকালে সেদিন দুগ্ধপোষ্য শিশু ব্যতিরেকে সকলেই উপবাসে থাকে। প্যাকালে যথাসাধ্য চেষ্টা করে অবস্থার একটু উন্নতি করতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। ক্ষুধার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হতেই থাকে। এরই মধ্যে মৃত্যুর দূত আসে; অত্যন্ত বেআব্রুভাবে চোখ রাঙিয়ে যায়। তিন জোয়ান ছেলেকে টেনে নিয়ে তার আশ মেটেনি। বাড়ির মেজ বউকে এখন লক্ষ্য করেছে সে। মেজ বউ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। সবমিলিয়ে প্রবল এক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে পথ হাঁটছে পরিবারটি—

দুই ছেলে মারা গিয়েছে স্ত্রী-পুত্র রেখে। ফলে সমস্ত সংসারের ভার গিয়ে পড়েছে প্যাকালের উপর। বৃদ্ধার ছোট ছেলে প্যাকালে। সারাদিন কাজ করে প্যাকালে যা পয়সা পায় তাই দিয়ে সন্ধ্যায় বাজার করে আনে। রান্না হয়, গোটা পরিবারের মুখে অন্ন ওঠে। যেদিন আয় রোজগারের কোনো পথ খুঁজে পায় না প্যাকালে সেদিন দুগ্ধপোষ্য শিশু ব্যতিরেকে সকলেই উপবাসে থাকে। প্যাকালে যথাসাধ্য চেষ্টা করে অবস্থার একটু উন্নতি করতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। ক্ষুধার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হতেই থাকে। এরই মধ্যে মৃত্যুর দূত আসে; অত্যন্ত বেআব্রুভাবে চোখ রাঙিয়ে যায়। তিন জোয়ান ছেলেকে টেনে নিয়ে তার আশ মেটেনি। বাড়ির মেজ বউকে এখন লক্ষ্য করেছে সে। মেজ বউ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। সবমিলিয়ে প্রবল

এক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে পথ হাঁটছে পরিবারটি— ''ওরা যেন মস্ত একটা পাহাড়ের গড়ানে খাদ বেয়ে চলেছে। মাথায় এঁটে দেওয়া বিপুল বোঝা, একটু থামলেই বোঝাসমেত হুড়মুড় করে পড়বে কোন এক অন্ধকার গর্ত্তে।''

ভয়ঙ্কর বাস্তবের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত প্যাঁকালেদের সংসার। সংসারের আনাচে কানাচে অভাব বিস্তৃত হয়ে আছে সাপের ফনার মতো করে। একটু বেসামাল হলেই বিষাক্ত দংশন সহ্য করতে হবে। সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষ এরা। তাই সামাজিক পাপও এদের মধ্যে বেশি। সেই পাপে এরা পোড়ে অহরহ। অভাবের সংসার, দিন আনা দিন খাওয়া। এর মধ্যে প্যাঁকালের বিবাহিত বোন এসে আশ্রয় নেয়। তার স্বামী অন্য এক মেয়েকে নিকে করেছে। ক্ষুধার সীমানা তাই আর একপ্রস্থ প্রসারিত হয়। এই ক্ষুধার সাম্রাজ্যের বর্ণনা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক — ''প্যাঁকালে চলে যাবার পরই তার দ্বাদশটি ভাইপো ভাইঝি মিলে যে বিচিত্র সুরে 'ফরিয়াদ' করতে লাগলো ক্ষুধার তাড়নায়, তাতে অন্নের মালিক যিনি, তিনি এবং পাষাণ ব্যতীত বুঝি আর সবকিছুই বিচলিত হয়।'' নজরুল চিরকাল বিদ্রোহী। অসহায় মানুষের কান্না তাঁর হৃদয়ের তারে দোল দেয় ভীষণ ভাবে। তাই চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু বিদ্রোহ করবেন কার বিরুদ্ধে। পার্থিব শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বিশেষ ফল হয় না। তাই একবুক অভিমান নিয়ে কবি শেষপর্যন্ত সরব হন ভগবানের বিরুদ্ধে। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, প্যাঁকালের ভাইপো-ভাইঝিদের কান্নায় অন্নের মালিকের ঘুম ভাঙে না। এমনিতে ভগবান আছে কি নেই তা নিয়ে নজরুলের মধ্যে কোনো সংশয় নেই। তিনি ঘোর আস্তিক। তবে কখনো কখনো তাঁর কণ্ঠেও উচ্চারিত হয় নাস্তিক্যের সুর — ''ক্ষুধার্তর শিশু চায় না স্বরাজ চায় দুটো ভাত একটু নুন/বেলা বয়ে যায় খায়নিক বাছা কচি পেটে তার জ্বলে আগুন/কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায় স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়/কেঁদে বলি, ভগবান, তুমি আজিও আছো কি?'' (আমার কৈফিয়ৎ) ভগবান আছে কি নেই সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বসে কবি বৃথা কালক্ষেপ করতে চান না। ভগবান থাকুন বা না থাকুন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা যে আছে তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। ক্ষুধার করাল গ্রাসে পড়ে আজ যারা বিপন্ন, তাদের বিপন্নতার ভার কিসে একটু লাঘব হয় তাই নিয়েই নজরুলের ভাবনা।

ক্ষুধিতদের কাছে জীবন একটা অভিশাপ। ক্ষুধার অনলে দগ্ধ হয় জীবনের সব সজীবতা। প্যাঁকালেদের সংসারে সন্তানের জন্ম কোন নতুনত্বের আবেশ বহন করে আনে না। প্যাঁকালের সন্তানসম্ভবা বোন পাঁচি'র প্রসব বেদনা উঠেছে। কিন্তু টাকার অভাবে পাঁচির মা ধাত্রী ডাকতে পারেনি। সারারাত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছে মেয়েটা। প্যাঁকালে সব দেখেছে, কিন্তু তাতে তার বিশেষ ভাবান্তর হয়নি। এটা যে প্যাঁকালের নিষ্ঠুরতা তা নয়। আসলে সত্যিই তার কিছু করার নেই। এ সংসার বড়ই নিষ্ঠুর। অর্থের লেনদেন ছাড়া এখানে কোনো কিছুই হওয়ার নয়। প্যাঁকালের অর্থ নেই। তার সমস্ত প্রয়াস তাই শেষপর্যন্ত শূন্যে মিলিয়ে যেতে বাধ্য। সব জেনে বুঝেই সে বিশেষ উদ্যোগী হয়নি। অতীতে এমন বহুবার হয়েছে। ঠেকে শিখেছে তারা । অতিরিক্ত চেষ্টা করলে তাতে যন্ত্রণার সীমাই শুধু প্রসারিত হয়। আজ তাই প্যাঁকালের মধ্যে বিশেষ হেলদোল লক্ষ করা যায় না।

যন্ত্রণার গভীর সমুদ্র সন্তরণ করে শেষপর্যন্ত উঠে আসে এক মানব শিশু। সে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান দাবি করে। সঙ্গে একটু ভালোবাসা। নিষ্ঠুর সংসার নবজাতকের এই সামান্য

যন্ত্রণার গভীর সমুদ্র সন্তরণ করে শেষপর্যন্ত উঠে আসে এক মানব শিশু। সে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান দাবি করে। সঙ্গে একটু ভালোবাসা। নিষ্ঠুর সংসার নবজাতকের এই সামান্য দাবিটুকু মেনে নিতে অনিচ্ছুক। তারা চেষ্টা করে যত দ্রুত সম্ভব তার জন্য এই পৃথিবীর আলো নিভিয়ে আনতে। এমন পাশবিক নির্মমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন কবি সুকান্ত —''এ পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।''

দাবিটুকু মেনে নিতে অনিচ্ছুক। তারা চেষ্টা করে যত দ্রুত সম্ভব তার জন্য এই পৃথিবীর আলো নিভিয়ে আনতে। এমন পাশবিক নির্মমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন কবি সুকান্ত —''এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।" (ছাড়পত্র) তিনি শেষপর্যন্ত পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন কি না সে অন্য প্রশ্ন। কিন্তু একথা প্রতিপন্ন হয়, সমকালীন পৃথিবী শিশুর বাসের জন্য সত্যিই অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। মৃত্যুক্ষুধা-য় নজরুল এই শিশুর বাসের অযোগ্য পৃথিবীর বর্ণনা দিয়েছেন নিপুণভাবে। একটা শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য পুরো সমাজ দায়বদ্ধ। কিন্তু সমাজ যদি নিজেই বিপন্ন হয় তবে শিশুর অধিকার রক্ষিত হবে কীভাবে। মৃত্যু ক্ষুধা-র সমকালীন সমাজ শুধু বিপন্ন নয়, চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত। অভাবের তাড়নায় সমাজের প্রতিটা মানুষ উৎকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ফলে প্যাঁকালের সংসারে শিশু'র অবস্থা বড় করুণ। প্যাঁকালে তার দেহ-মন নিংড়ে বার করে আনে একমুঠো স্নেহ, ভালোবাসা। অতঃপর তার উপর ভর করে ভাগ্নের মুখ দেখতে যায়। কিন্তু তারপরেও শেষরক্ষা করতে পারে না।

বিধবা সেজ বৌ স্বামীর চিহ্ন স্বরূপ ছেলে কোলে নিয়ে টাইফায়েডে ভুগছে। টাইফায়েডের উপযুক্ত চিকিৎসা ও পথ্য অভাবের সংসারে জোটেনি। ফলে সেজ বৌ এর অবস্থা খুবই করুণ —''কসাই যেমন করে মাংশ থেতলায়, রোগ- শোক-দুঃখ- দারিদ্র এই চারটিতে মিলে তেমনি করে যেন থেতলেছে ওকে।" আর তার কোলের সন্তান- ''শুষ্ক ক্ষীণকণ্ঠে অসহায় শিশু কাঁদে, আর একবার করে তার কণ্ঠের চেয়েও শুষ্ক মায়ের বুকে একবিন্দু দুধের আশায় বৃথা কান্না থামায়, আবার কাঁদে। কান্না তো নয়, যেন বেঁচে থাকার প্রতিবাদ। যেন ওকে কে গলা টিপে মেরে ফেলছে।" সেদিনের সমাজ এই শিশুর দিকে তাকায়নি। তাকাতে পারেনি তার আত্মীয়রাও। তারা নিজেরাই তখন স্রোতের মুখে প্রাণপণে সাঁতার কাটছে, অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করছে। এমন কঠিন লড়াই এ অবতীর্ণ যে মানুষগুলি তারা কখনো কখনো নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। যেমন হয়েছে প্যাঁকালের মা এর ক্ষেত্রে। —''নে লো ব্যাটাখাগীরা, তোদের এই হারামদের মাথা চিবিয়ে খা। মাগীরা শুয়োরের মতো ছেলে বিইয়েছে।" এ কোনো সুস্থ মানুষের ভাষা হতে পারে না। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, যে একজন মা এইভাবে বলতে পারে। অথচ এই অবিশ্বাস্যটাই বাস্তব। আর এটাই মৃত্যুক্ষুধা-র মূল সুর।

ক্ষুধার উত্তাল স্রোতের মুখে বালির বাঁধ দিতে দিতে ক্লান্ত প্যাঁকালে একদিন হাল ছেড়ে দেয়। সংসার ছেড়ে পালিয়ে যায় সে। ঘোর অন্ধকারের মাঝে জোনাকির সামান্য আলো হয়ে জ্বলছিল যে প্যাঁকালে তার অন্তর্ধানে পরিবারটা একেবারে শেষদশায় উপনীত হয়। বাইরে প্যাঁকালে ভিতরে মেজ বউ, এই ছিল এতদিনের সমীকরণ। দু জনে দুটি দিক সামলাতো তারা। প্যাঁকালে নেই। একা লড়াই করতে করতে একসময় মেজ বউও নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। ছেলে মেয়েদের ফেলে রেখে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা নিয়ে সে চলে যায় সুদূর বরিশালে। তার সন্তানেরা মায়ের পথ চেয়ে বসে থাকে। বোন দাদাকে জিজ্ঞাসা করে, মা তাদের ফেলে কোথায় গেছে, কেন গেছে? এ প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পায় না তারা। তাই পথ চেয়ে থাকারও আর শেষ হয় না। মেজ বউ ফিরে আসে না। আশার প্রদীপ একদিন নিভে আসে। মায়ের কোলে আশ্রয় না পেয়ে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয় সাত আট বছরের ছেলেটি। এতদিনে পাষাণ দেবতার ঘুম ভাঙে। ফিরে আসে মেজ বউ। মৃত ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে শ্মশানের চিতার মতো জ্বলতে থাকে সে। প্যাঁকালেদের পরিবার তখন ঘোর মৃত্যুপুরী। প্রেতাত্মার মতো করে এ পুরীর দ্বার রক্ষা করছে প্যাঁকালের মা। ঔপন্যাসিক গোটা ছবিটাকে ফুটিয়ে তুলেছেন নিপুণ কালির আঁচড়ে। বাস্তবতার এই নিরাবরণ রূপ, তার এমন শৈল্পিক নির্মিতি সেদিনের শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যের আদ্যন্ত কালসীমায় একান্ত দুর্লভ।

৪

মানব মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত ছিলেন নজরুল। কবি জীবনের প্রথম লগ্নে স্বাধীনতার সুর উচ্চারণ করে জেলে গিয়েছিলেন তিনি। যৌবনের উন্মাদনার অবসান হলে অবশ্য তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যায় সুরের একটু রদবদল। তখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপেক্ষা শোষণ মুক্ত সমাজের স্বপ্নে বিভোর তিনি। সাম্যবাদী ধ্যান ধারণা থেকে লেখেন অসংখ্য কবিতা। 'কুলি মজুর' তাঁর এই ধারার সবচেয়ে স্মরণীয় সৃষ্টি। কবি নজরুলের মধ্যে এই যে সাম্যবাদী ভাব ভাবনার প্রকাশ রয়েছে তাই বিশেষ করে ছায়াপাত করেছে মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে। আমাদের সমাজ তখন ভয়ঙ্করভাবে শোষণক্লিষ্ট। সামাজিক পরিকাঠামোয় শ্রমিক, কৃষক, মেথর, ঝাড়ুদারদের মতো মানুষদের অবস্থান একেবারে নিম্নশ্রেণিতে। তাদের না আছে কোনোরকম সম্মান, না আছে

ক্ষুধার অন্ন। জীবন তাদের কাছে আক্ষরিক অর্থেই অর্থহীন। এই নিম্নশ্রেণির মানুষদের অধিকারের দাবিতে, তাদেরকে ন্যূনতম সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে একদা কার্ল মাকস সরব হয়েছিলেন। পরবর্তীতে মার্কসের ভাবনা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রচারিত হয় সাম্যবাদের বাণী। সাম্যবাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রেণি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন অসংখ্য শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। মৃত্যুক্ষুধা-য় রয়েছে এই শ্রেণি সংগ্রামের পটভূমি। শ্রেণি সংগ্রাম এখানে বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে শ্রমিক আন্দোলনের বাতাবরণে। উপন্যাসটির সূচনায় ছিল যে দারিদ্র্যদীর্ণ পারিবারিক জীবনের চিত্রণ ধীরে ধীরে তার রঙ বদলে যায়। উপন্যাসের অঙ্গনে দেখা মেলে আনসার নামের এক নব যুবকের। আনসার শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক। কৃষ্ণনগরকে কেন্দ্র করে শ্রমজীবী মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে মাঠে নেমেছে সে। কৃষ্ণনগর কোর্টে চাকুরিরত নাজির সাহেবের গৃহিণী লতিফা আনসারের সম্পর্কে বোন হয়। এই সম্পর্কের সূত্রে সে আপাতত নাজির সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

দেখতো না। ফলে কড়া পাহারায় মধ্যে থাকতে হতো আনসারদের। এই পাহারায় আনসার অবশ্য ভয় পেত না, বরং মজাই পেত — ''আমাদের কি কম সম্মান রে বুঁচি। সর্বদা সাথে সাথে দুজন সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী। কোথাও একটা গেলে বা এলে আগেই পুলিশ অফিসার গিয়ে অভিনন্দিত করে স্টেশনে। তারপর দুবেলা আমাদের দিন কেমন ভাবে কাটছে খবর নেয়— একেবারে দ্বিতীয় লাট সাহেব আর কি।'' পুলিশের এহেন নজরদারির ভিতর দিয়েই আনসার শ্রমিক আন্দোলনের বাণী প্রচার করে বেড়িয়েছে ময়মনসিংহ, সিলেট, ত্রিপুরা, কুমিল্লা, পাটনা নানা জায়গায়। বর্তমানে সে কৃষ্ণনগরকে কেন্দ্র করে তার জাল বিস্তার করতে তৎপর।

কৃষ্ণনগরে এসে আনসার অসহায় নিম্নশ্রেণীর মেথর, কুলি, গাড়োয়ান, কৃষক, শ্রমিকদের নিয়ে দল গঠন করতে থাকে। এইসব মানুষদের অধিকারের দাবিতে সরব হয়ে ওঠার মন্ত্র পাঠ করায়। আনসারের ডাকে উদ্বেল হয়ে ওঠে কৃষ্ণনগরের শ্রমিক-কৃষক সমাজ। তারা এক জোট হয়ে দল গঠনের কাজে

''যে মৃত্যুক্ষুধার জ্বালায় এই পৃথিবী টলমল করছে, ঘুরপাক খাচ্ছে, তার গ্রাস থেকে বাঁচবার সাধ্য ও বাঁচাবার সাধ্য কারুরই নেই। তোমরা মনে রেখো, তোমরা আমার উদ্ধারের জন্য এখানে আসনি, তোমাদের সে মন্ত্র আমি কোনদিনই শেখাইনি, তোমরা তোমাদের উদ্ধার করো— সেই হবে আমার বড় উদ্ধার। তোমাদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমিও মুক্ত হব। এসেছ, নমষ্কার নাও, আমার দোষ ত্রুটি, অপরাধ ক্ষমা কর, তারপর যদি আসতেই হয় আমার পথে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এসো আমার পিছনে। বিপুল বন্যার বেগে এসো, এক মুহূর্তের জোয়ারের বেগে এসো না। আমি ভেসে চললুম, দুঃখ নেই, কিন্তু তোমরা এসো বী-র দর্পে।''

রাজনৈতিক জীবনের প্রথমে আনসার গান্ধীজী নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসি আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিল। চরকা কাটার মধ্যে দিয়ে সে তখন ভারতমুক্তির স্বপ্ন দেখতো। কিন্তু বর্তমানে আনসার আর ওই ধরণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়—''বাঁক বোঝাই বারে বারে, চরকা বয়ে বয়ে কাঁধে ঘাঁটা পড়ে গেছে। তোর সেই চরকা দাদু আনসারের মত কি শুনাবি? সে বলে, সুতোয় কাপড় হয়, দেশ স্বাধীন হয় না।'' এখন সে গান্ধীজী'র অহিংসার পথ ছেড়ে সহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী। এই সহিংস আন্দোলন কারীদের সেদিনের ইংরেজ সরকার অবশ্যই ভালোচোখে

কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়। কিন্তু সরকার একটা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিকদের উৎসাহের মূলে জল ঢেলে দিতে, তাদের মনে ভয় ধরিয়ে দিতে তারা আনসারকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের সময় হাজার হাজার কৃষক- শ্রমিক, গাড়োয়ান, কচোয়ান জড়ো হয়। তারা তাদের নেতাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে দেবে না। কিন্তু আনসার তাদের শান্ত করে। সে নিজে থেকে গ্রেপ্তার বরণ করে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন আনসার এই উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করল? সে তো তার শ্রেণি সংগ্রামের প্রত্যক্ষ লড়াই এখান

থেকেই শুরু করতে পারত। তাতে বিপ্লব আরও ভাষা পেত। কেন আনসার তাদের ক্ষেপিয়ে তোলেনি তার উত্তর সে নিজেই দিয়েছে—'' ভয় নেই সাহেব, এরকম বক্তৃতা অনেক দিয়েছি, কিন্তু ঐ জয়ধ্বনি তোলা ছাড়া তাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে পারিনি, আজও পারবো না।'' সহিংস আন্দোলনের নেতৃবর্গের অভাব সেদিনের ভারতবর্ষে ছিল না। জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়ার যোগ্য লোক দেশের নানা প্রান্তে দলে দলে ছড়িয়ে ছিল। তবু ভারতবর্ষের পরাধীনতার শৃঙ্খল দুই শত বৎসর বিস্তৃত হয়েছিল। আসলে হাজার হাজার বক্তার জ্বালাময়ী বক্তৃতাও স্থবির ভারতবাসীকে জাগাতে পারেনি। দুর্বার জলস্রোতের মতো করে নিয়ে আসতে পারেনি যুদ্ধের ময়দানে। আনসার ইতিহাসের এই পাঠ সম্পর্কে সচেতন ছিল। সে জানত দেশের মানুষ এখনও প্রস্তুত নয়। কৃষ্ণনগরের এই সামান্য কয়েকজন মুটে মজুরকে নিয়ে শেষপর্যন্ত লড়াই করা যাবে না। তাই আরও সময় নিতে চেয়েছিল সে। বিনা প্রতিবাদে কারাবরণ করেছিল।

বিপ্লবীরা চির আশাবাদী। স্বাধীনতার স্বপ্নে তাদের বুক ভরে থাকে বলেই তারা হাজার রকম বিপদ আছে জেনেও বিপ্লবের ধ্বজা হাতে ধরে। আনসারের বুকেও জমা ছিলো এক রাশ স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন সাধনার শক্তি কারও একার মধ্যে নেই। আছে ভারতীয় জাতিসত্তার মধ্যে। তাই আনসার গ্রেপ্তারের মুহূর্তে ভারতীয় জাতিসত্তাকে জাগানোর চেষ্টা করেছে —''যে মৃত্যুক্ষুধার জ্বালায় এই পৃথিবী টলমল করছে, ঘুরপাক খাচ্ছে, তার গ্রাস থেকে বাঁচবার সাধ্য ও বাঁচাবার সাধ্য কারুরই নেই। তোমরা মনে রেখো, তোমরা আমার উদ্ধারের জন্য এখানে আসনি, তোমাদের সে মন্ত্র আমি কোনদিনই শেখাইনি, তোমরা তোমাদের উদ্ধার করো— সেই হবে আমার বড় উদ্ধার। তোমাদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমিও মুক্ত হব। এসেছ, নমস্কার নাও, আমার দোষ ত্রুটি, অপরাধ ক্ষমা কর, তারপর যদি আসতেই হয় আমার পথে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এসো আমার পিছনে। বিপুল বন্যার বেগে এসো, এক মুহূর্তের জোয়ারের বেগে এসো না। আমি ভেসে চললুম, দুঃখ নেই, কিন্তু তোমরা এসো বী-র দর্পে।'' একজন আদর্শবাদী বিপ্লবী নেতার এটাই যথার্থ আহ্বান। ব্যক্তির মুক্তি নয়-সমষ্টির মুক্তিই এখানে শেষ কথা। আনসারের এই বক্তব্যের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় নজরুলের-''কারার ঐ লৌহ কপাট- ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট'' এই গানটির। এখানে সমষ্টির সম্মিলিত আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সাম্যবাদ। যে সাম্যবাদের বাণী নজরুল আগেও প্রচার করেছিলেন কবিতার সাহায্যে— ''তুমি শুয়ে রবে তেতলার পরে আমরা রহিব নিচে/অথচ তোমারে দেবতা বলিব সে ভরসা আজ মিছে।'' মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে শ্রমজীবী মানুষদের মনে নজরুল এই চেতনাকেই বেশি করে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই উপন্যাসের বিপ্লবী নায়ক আনসার নিজের মুক্তি অপেক্ষা জনসাধারণের চেতনাকে জাগ্রত করার উপর জোর দিয়েছেন।

আমাদের দেশে মার্কসবাদ তখন একটু একটু করে প্রচার প্রসার পেতে শুরু করেছে। তখনও কোনো সমাজ আন্দোলনের পটভূমি তৈরি হয়নি। সাহিত্যের অঙ্গনে মার্কসবাদের রূপায়ণ দূর অস্ত। নজরুল লিখলেন মৃত্যুক্ষুধা। এক হিসাবে মার্কসবাদের সারসত্য উচ্চারিত হল এখানে। তাই মৃত্যুক্ষুধা-ই বাংলার প্রথম মার্কসীয় সাহিত্য। শরৎচন্দ্রের পথের দাবি-তে বিপ্লবের কথা আছে, কিন্তু মার্কসবাদের কোনো তাত্ত্বিক নির্মিতি সেখানে নেই। মৃত্যুক্ষুধা-র রূপকার নজরুল নিজে হয়তো দীক্ষিত মার্কসবাদী নন, তবে মাকস্‌বাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। যে মুজফফর আহমেদ ভারতে মার্কসবাদের গোড়াপত্তন করেছিলেন তিনি ছিলেন নজরুলের পরম বন্ধু। জীবনের অনেকটা সময় তাঁরা এক ছাদের নিচেয় এক ঘরে কাটিয়েছিলেন। সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাগত নজরুল তখন কলকাতায় এসেছেন, থাকার জায়গা হচ্ছে না। শেষপর্যন্ত ব্যবস্থা হল মুজফফর আহমেদ এর কাছেই। তাঁদের বন্ধুত্বকে ঘিরে টানাপোড়েন যে হয়নি তা নয়; তবে তার প্রভাবে মূলের সূত্রটা কখনো ছিন্ন হয়ে যায়নি। মার্কসবাদী ভাব-ভাবনা তাই নজরুলের চেতনার মূলে শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছিল। সেই শাখা প্রশাখা সহ মার্কসিস্ট নজরুলের বৌদ্ধিক সত্তার চূড়ান্ত প্রকাশ মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসটি। বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় তাই এই উপন্যাসের মূল্যায়ন হওয়া দরকার আলাদা করে।

৫

নজরুল ইসলাম সাহিত্যের অঙ্গনে পা রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সৌন্দর্যভাবনার বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে। কল্পনাশ্রয়ী-রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বস্তু পৃথিবীর রক্তাক্ত মানুষের রক্ত-মাখা জীবন যাত্রাকে নিরাসক্ত ভাবে বর্ণনা করাই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অচিরেই তাঁর ভুল ভাঙে। হৃদয়কে উপবাসী রেখে যে কোনো সাধনা চলে না, এ প্রত্যয়ে উপনীত হন তিনি। এতে তাঁর সাহিত্যে

বিপ্লববাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে উঠে আসে প্রেম। প্রেমকে কবি স্থান দেন বিপ্লবের ঠিক পাশের আসনটিতে। বিদ্রোহী কবিতায় কবি যেখানে বলেন —''বল বীর,/বল চির উন্নত মম শির/শির নেহারি আমারি নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।'' তারই পাশাপাশি প্রেমের ফল্গুধারা বইয়ে দেন —''আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি ছল করে দেখা অণুখন/আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা তার কাঁকন চুড়ির কন কন।।/আমি বন্ধন হারা কুমারীর বেণী তন্বী নয়নে বহ্নি।/আমি ষোড়শীর হৃদি সরসিজ প্রেম উদ্দাম আমি ধন্যি।''

প্রথম যৌবনের উদ্দীপনায় বিপ্লবকে জীবনের মূল সুর হিসাবে গ্রহণ করলেও প্রেমকে স্বীকার করে নিতে শেষপর্যন্ত তাঁর কোনো দ্বিধা হয়নি। প্রেম ও বিপ্লবকে একাসনে বসিয়ে অতঃপর নজরুলের যে পথ চলা সে পথচলার প্রামাণ্য ইতিহাস মৃত্যুক্ষুধা। এ উপন্যাসে রক্তাক্ত বাস্তবের রূপায়ণ আছে, বিপ্লবের বিপুল আহ্বান আছে, আর তারই সঙ্গে মিশে আছে অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথে মানব মনের চলাচলের বৃত্তান্ত।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে প্রথম প্রেমানুভূতির স্পর্শ পাওয়া যায় প্যাঁকালের মেজ ভাবী, বাড়ি'র মেজ বৌকে কেন্দ্র করে। মেজ বৌ অপরূপ সুন্দরী, বয়সের সঙ্গে সমানুপাতিক হারে বর্ধনশীল তার দুরন্ত যৌবন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে অকালে বিধবা হয়েছে সে। অভাবের সংসারে কোনরকম সখ আহ্লাদের সঙ্গে পরিচয় হয় না কিছুতেই। সাংসারিক অভাব অনটন, অকাল বৈধব্য; কিন্তু তারপরেও মেজ বৌ একেবারে ফুরিয়ে যায় না। হৃদয়ের কোণে কোণে প্রেম ভালোবাসাকে ধারণ করে প্রাণপণে। কাজের ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে গান গায়। —'' নিষ্ঠুর কালার নাম করোনা/কালার নাম করিলে প্রাণ কাঁদিবে/কালায় পড়িবে মনে গো!/নিষ্ঠুর কালার নাম করোনা।'' তার গানে দুকূল প্লাবিত করে বয়ে যায় ব্যর্থ প্রেমের ঝর্ণা। মেজ বৌ যখন গান গায় তার গলার সুর যেন বাদল রাতের হাওয়ার মতো করে কাঁপে। মেজ বৌ এর গানের সুর স্মরণ করায় বিরহাতুর রাধার কথা। কৃষ্ণ ভালোবাসার সর্বোত্তম প্রকাশ দেখিয়ে অসহায় রাধাকে ফেলে মথুরায় চলে গিয়েছে। রাধার হৃদয়ভেদী কান্নায় বৃন্দাবনের আকাশ বাতাস তখন কম্পমান। আজ মেজ বৌও অকালে স্বামীকে হারিয়ে অভাবের সংসারে নিতান্ত একা। রূপ-যৌবন কোনো কিছুই তার কম নেই। এখনও দেহ সমুদ্রে সমানভাবে জোয়ার ভাটা খেলে। কিন্তু এ দেহ নিয়ে সে কী করবে। বাইরে শত্রুরা ওত পেতে রয়েছে। মুহূর্তের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তারা। ছিঁড়ে কুটে নষ্ট করে দেবে তাকে। মেজ বউ তাই আত্মরক্ষার পথ খোঁজে। নিজেকে আরও বেশি করে জড়িয়ে রাখার চেষ্টা করে সংসারের সঙ্গে। নিজের দুটি বাচ্চা আছে। ওদেরকে আঁকড়ে ধরে। সেইসঙ্গে বাড়ির অন্য বাচ্চাদেরও যথাসম্ভব আগলে রাখার চেষ্টা করে সে। মৃত্যুপথযাত্রী সেজ বউ এর শয্যার পাশে বসে কাটিয়ে দেয় কত বিনিদ্র রাত। প্যাঁকালেদের অবশিষ্ট পরিবার যখন মরুভূমি প্রায় মেজ বউ তখন সেখানে মরূদ্যান হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। প্রেম এক নতুন পথে ফলবতী হয়েছে তার মধ্যে।

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে প্রেমের দ্বিতীয় কারিগর আনসার। বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত আনসারের ভবঘুরে জীবনেও একদা প্রেমের ঝড় উঠেছিল। সে ভালোবেসেছিল রুবি নামের একটা মেয়েকে। তবে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে রুবিকে বিয়ে করে সংসার করার কথা ভাবেনি আনসার। বিপ্লবের তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে প্রেম-ভালোবাসার নীড় বাঁধা তখন একরকম অসম্ভব। অসম্ভব জেনেও সেদিন সে নিজেকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়েছিল। ততদিনে রুবিও তার ভালোবাসার মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। অশনি সংকেতের পাঠ নিতে ভুল হয় না আনসারের। নিরুদ্দেশ হয় সে। নিরুদ্দিষ্ট আনসারের জন্য শেষপর্যন্ত পথ চেয়ে বসে থাকা সম্ভব হয় না রুবির পক্ষে। পরিবারের চাপের কাছে হার মেনে বিয়ের পিড়িতে বসতে হয় তাকে। এদিকে বিবাহিতা রুবি অল্পদিনের ব্যবধানে বিধবা হয়। বিধবা হয়ে মুক্তির আনন্দ খুঁজে পায় সে। এখন ভালোবাসার পুরুষের ধ্যানে মগ্ন থাকার পথে তার আর কোনো বাধা রইল না।

বহুদিন পরে আবার দেখা হয় আনসার-রুবিতে। বিধবা রুবিকে দেখে বক্তৃতার মঞ্চে দণ্ডায়মান আনসার নিজেকে সামলাতে পারে না। সুবক্তা বলে এমনিতে পরিচিতি আছে তার। আজ আনসার কিছুতেই ভালো করে কথা বলতে পারছে না। তার সবকিছু যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। পোড় খাওয়া বিপ্লবী আনসার অবশ্য শেষপর্যন্ত নিজেকে সামলে নেয়। রুবির স্পর্শ থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যায় আরও আরও দূরে। এতকিছুর পরেও ভিতরের আগুন কিন্তু নেভে না। দুই ব্যর্থ প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরের স্মৃতি বুকে করে বেঁচে থাকে। প্রেমের এই পরিণতির মাঝে দাঁড়িয়ে রুবি একসময় একটা আলাদা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। সে ভালোবাসে আনসারকে, কিন্তু তাকে আর ব্যক্তিজীবনে ফিরে

পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে না। আত্মপক্ষ সমর্থন করে সে বলে — ''একটা কথা বলছি ভাই বুঁচি। আমরা হয়তো বেঁচে যেতুম সত্যি, কিন্তু তোর দাদু বাঁচত না।'' আনসারের মধ্যে যে এক ছন্নছাড়া বিপ্লবী সত্তা আছে তার সন্ধান রুবি প্রথম দিন থেকেই পেয়েছিল। এমন পুরুষের সঙ্গে আর যাই হোক সংসার করা চলে না। তাই কতকটা প্লেটোনিক প্রেমের পথ ধরে রুবি তার প্রেমাষ্পদকে ছড়িয়ে দেয় জগতের মাঝে। নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চায় নানা সামাজিক কাজে।

প্লেটোনিক লাভের তত্ত্বভাবনা থেকে রুবি আনসারের প্রেম কাহিনির প্রথম অধ্যায় রচনা করেছেন নজরুল। যথার্থ প্রেমের যে কোনো দাবি থাকে না, সে প্রেম কেবল দিতেই জানে প্রতিদান চায় না, এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রুবি-আনসারের প্রেমের সূত্রে। কিন্তু প্রেমের এই তাত্ত্বিক রূপায়ণে নিজেকে শেষপর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেননি ঔপন্যাসিক নজরুল। অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী আনসারের প্রাণোত্তাপের শেষ বিন্দু শুষে নিয়েছে ইংরেজ রাজশক্তি। যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত আনসারকে জেলখানা থেকে চিরমুক্তি দিয়েছে তারা। মৃত্যুর জন্য যখন প্রতিদিন, প্রতিঘণ্টা, প্রতি সেকেন্ড গুণে গুণে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তখন এক দুর্বলতা চেপে বসে আনসারের বুকে। বুঁচিকে চিঠি দিয়ে সে জানায় আজ আনসার রুবি'র সাহচর্য চায়। এই চিঠি চির সংযমি রুবিকে দুর্বার করে তোলে। ঘূর্ণি ঝড়ের মতো করে সে নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় ওয়ালটেয়ারের ময়দানে। আনসারের তখন একেবারে শেষ অবস্থা। একমুহূর্ত নষ্ট করার সুযোগ নেই। রুবি সরাসরি নিজেকে সপে দেয় তার বুকে। চির বুভুক্ষু আনসার গোগ্রাসে গিলতে থাকে রুবিকে। দেহ মিলনের এই উদ্বেলতায় তারা ক্ষণিকের জন্য অস্বীকার করে মৃত্যু রূপ ভয়ঙ্করকে। তারপর একসময় মৃত্যুর হিমশীতল গভীরে হারিয়ে যায়।

আনসার ও রুবি, একজন বিপ্লবের জন্য আত্মত্যাগ করে অন্য জন কেবলমাত্র ভালোবাসার মানুষকে তার নিজের জায়গায় সুখি রাখার জন্য সব সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দেয়। এভাবেই নারী-পুরষের সম্পর্ক শাশ্বত হয়। পৃথিবী পরিক্রমণ করে দিগ্‌বিজয়ী বীর ফিরে আসে তার ঘরের কোণে, ভালোবাসার ভিখারি হয়ে। প্রিয়তমার বুকের স্পর্শে শীতল হয় সে। এখানেই সংসারে নারীর ভূমিকা। রুবি সেই চিরন্তন নারী সত্তার প্রতিমূর্তি। প্রথম যৌবনে স্বামীকে ভালোবাসতে না পারলেও স্বামীর অসুস্থতার সময় তাকে সেবা যত্নে ভরিয়ে দিয়েছিল সে। আর আজ, ভালোবাসার মানুষের জন্য নিজেকে নিঃশেষে নিংড়ে দিয়েছে। প্রেমের এই আদর্শায়িত রূপায়ণ তখনও আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ। নজরুল এক অনাস্বাদিত রস আস্বাদন করালেন বাংলা সাহিত্যের পাঠককে। মৃত্যুক্ষুধা-য় প্রেম দেহের সীমানা অতিক্রম করেনি, আবার দেহজ প্রেমের আবর্তে পড়ে দিগভ্রষ্ট হয়নি। কাম ও প্রেমের এমন দ্বৈত খেলায় সফল হননি বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, এমনকি শরৎচন্দ্র। এই সর্বাত্মক ব্যর্থতার মাঝে সাফল্যের আশ্চর্য উদাহরণ মৃত্যুক্ষুধা। এমন একটি উপন্যাস এখনও পর্যন্ত সেই অর্থে সমালোচকের অনুগ্রহ লাভ করল না! দ্রুত এ অপূর্ণতার অবসান হোক।

সম্পাদনা : সাইফুল্লা ও কামরুল হাসান

প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে

বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা

বুকস স্পেস

২বি/৩, নবীন কুণ্ডু লেন ● কলকাতা-৯ ● যোগাযোগ : ৯১৪৩১৩৪৯৯৩

‘বাঁধন-হারা’ উপন্যাসের আড়ালে আত্মঘোষণা

সেখ জাহির আব্বাস

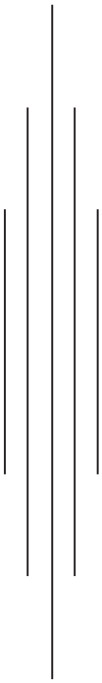

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেলে করাচি সেনানিবাস থেকে প্রায় আড়াই বছরের (১৯১৭ শেষ ভাগ থেকে ১৯২০-র মার্চ/এপ্রিল) সৈনিক জীবন অতিবাহিত করে ১৯২০-র এপ্রিলে বাংলায় ফিরে আসেন কাজী নজরুল ইসলাম। ইতিমধ্যে সেনা ছাউনিতে বসেই তিনি লিখে ফেলেন প্রথম গদ্যগ্রন্থ ‘বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী’। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা ‘মুক্তি’ এখানেই লেখা। হেনা, ব্যথার দান, মেহের নেগার, ঘুমের ঘোরে প্রভৃতি গল্প সেনানিবাসে বসেই লিখেছিলেন নজরুল। পড়া ছেড়ে হঠাৎ সেনাবাহিনীতে যোগদান, প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতা, বন্ধনমুক্তির উপলব্ধি আর গদ্য রচনার সামর্থ্যকে সম্বল করে পরিকল্পনা করলেন নতুন ধারার এক উপন্যাস লেখার। নজরুলের প্রথম উপন্যাস ‘বাঁধান-হারা’র প্রস্তুতি প্রবাসেই। এটি বাংলা ভাষার প্রথম পত্রোপন্যাস। ১৭টি পত্রের সমন্বিত রূপ এই উপন্যাস। সাত- আটটি চরিত্রের পারস্পরিক চিঠির আদান প্রদানের ভিতর দিয়ে উপন্যাসের অবয়ব গঠিত হয়েছে। ১৯২৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও করাচি থেকে ফিরে এসে লিখতে থাকেন এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ (১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা) থেকে উপন্যাসের পত্রগুলি ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নজরুলের তখন বাইশ বছর বয়স। যখন ‘বাঁধন-হারা’র পত্রগুলি লিখতে শুরু করেছেন তখন নজরুল বিদ্রোহী কবি হননি, মানে তখনও ‘বিদ্রোহী’ কবিতা লেখা হয়নি। ‘বিদ্রোহী’ লিখেছিলেন ১৯২১ এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে। ‘বিদ্রোহী’তে যে আত্মবোধের স্বতোৎসার আছে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নজির মিলবে ‘বাঁধন-হারা’র পত্রে পত্রে।

বাঁধন-হারা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নূরু ওরফে নূরুল হুদা এক আবেগতাড়িত হুল্লোড়প্রিয় বলিষ্ঠ যুবক। রবিয়লের বোন রাবেয়ার বিয়ে হয় মনুয়রের সাথে। রাবেয়াকে নূরু ভাবী সম্বোধন করে। মনুয়রের বোন সোফিয়া। সোফিয়া, মাহবুবা, সাহসিকা সম্পর্কে তিন বোন যেন তিন সখী। সোফিয়ার মনের কোণে নূরুর জন্য একটা সুপ্তবাসনা জন্ম নিলেও তা গোপন থেকে যায়। সোফিয়াকে বিয়ে করে রবিয়ল। নূরু অনিন্দ্যসুন্দরী মাহবুবাকে দেখেই মুগ্ধ হয়। নূরুকেও মন দিয়ে ফেলে মাহবুবা। এদের পূর্বরাগকে শুভাকাঙ্খিনী ভাবী রাবেয়া প্রশ্রয় দেয়। সমাজে বিবাহের পূর্বে প্রেম নিন্দনীয় হলেও রাবেয়া মনে করেন সত্যিকারের সুখ শান্তির জন্য পরস্পরকে চিনে নেওয়া দরকার।

সম্পর্ক জানাজানির পর বিবাহের যখন আয়োজন চলছে নূরুল হুদা তখন আসন্ন বন্ধনকে উপেক্ষা করে সৈনিক পদে যোগদান করে চলে যায় সুদূর করাচির সেনানিবাসে। চিরকুমারী সাহসিকা নূরুর স্বেচ্ছাচারী বেদুইন স্বভাবকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে সাত দিনের জ্বরে মাহবুবার বাপজান ইহলোক ত্যাগ করলে মাহবুবা ও তার মাকে তার মামারা নিয়ে চলে যায়। চল্লিশোর্দ্ধ এক বিপত্নীক জমিদারের সাথে মাহবুবার বিয়ে হয়। কিন্তু সম্পদ ঐশ্বর্য এসব তাকে শান্তি দেয় না। সে দিনরাত বই পড়ে, খবরের কাগজে যুদ্ধের খবর পড়ে। আর তার মন আরব সাগরের উপকূলে তরঙ্গ ভঙ্গের মত মাথা খুঁড়ে মরতে চায়। এই হল উপন্যাসের সারসংক্ষেপ।

নজরুল যখন এই উপন্যাস লিখতে শুরু করেন তখন বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটেনি। বাংলা কথাসাহিত্যে তখন অবশ্য শরৎচন্দ্র আর রবি ঠাকুর স্বতন্ত্র ঘরানা তৈরি করেছেন। তরুণ নজরুল উপন্যাস সাহিত্যের অঙ্গনে নিয়ে এলেন সম্পূর্ণ নতুন স্টাইল। 'বাঁধন-হারা'-র এক একটা পত্র যেন এক একটা অধ্যায়। উপন্যাস রচনার শতবর্ষ পরে মোবাইল ইন্টারনেটের যুগে পত্র লেখার শিল্পটি যখন ইতিহাস হয়ে গেছে তখন এর শিল্পমূল্য স্বতন্ত্রভাবে অনুভূত হয়। নূরুর এবং অন্যান্য চরিত্রগুলির লেখা চিঠিতে নূরুল হুদার যে মূল্যায়ন উঠে আসে, তাতে স্পষ্ট হয় নূরুল হুদা আদপে নজরুলেরই আত্ম প্রতিকৃতি। নূরুর মধ্যে নজরুলকে যতটুকু খুঁজে পাওয়া যায় বা আত্মজীবনের অভিক্ষেপ উপন্যাসের ঘটনাক্রমে নজরুল যে ভাবে তুলে এনেছেন তাতে 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসকে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলাটা অসঙ্গত হবে না।

নিজেকে চেনা যে কোন ব্যক্তি মানুষের জন্য সব চেয়ে কঠিন কাজ। তারুণ্যে প্রবেশ করে নিজের ভিতরকার প্রতিভাকে চেনা মহৎ প্রতিভার ক্ষেত্রেই সম্ভব। তরুণ রবীন্দ্রনাথ যেদিন নিজেকে চিনেছিলেন সেদিন প্রাণের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি; উদ্বেলিত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন 'কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ-/দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান'। (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ) নজরুলের যখন আত্মোপলব্ধি ঘটে, তিনিও ঘোষণা করেন, 'আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!' (বিদ্রোহী)। নজরুলের এই আত্মশক্তির উদ্বোধন বিদ্রোহী কবিতায় প্রতিটি ছত্রে যেমন উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি সমসাময়িক কালে রচিত 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের পত্রগুলিতেও পরোক্ষ রূপে আছে নজরুলের উদ্দাম বন্ধনমুক্ত প্রতিভার বিচিত্র রূপের প্রতিভাস। নূরুর মধ্যে নজরুল যা হতে যাচ্ছেন তার সুস্পষ্ট ঘোষণা আছে। নজরুলের সমগ্র জীবন সহস্র আভিঘাতের সমাহার। তবে যে পর্যায়ে জীবনের বিচিত্র উৎক্রান্তিতে নজরুল নিজেকে আবিষ্কার করছেন তার প্রেক্ষাটের সঙ্গে 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের কিছু কিছু সাযুজ্য আছে। করাচি সেনাশিবির থেকে ফিরে হাবিলদারের চাকরি থেকে অব্যাহতি নেওয়া নজরুলের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা দরকার। নজরুল যখন ফিরে এলেন তখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে অসহযোগ আন্দোলন। অচিরেই তিনি হয়ে ওঠেন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। সভায় যোগদান আর নিজের সুরে নিজের স্বদেশী গান গেয়ে আলোড়ন তোলা ছিল তাঁর কাজ। এরি মধ্যে ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে গ্রন্থ প্রকাশক আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়। আলী আকরের সাথে তিনি আসেন কুমিল্লায় তাঁর সহপাঠী বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তদের বাসায়। বীরেন্দ্রকুমারের মা বিরজাসুন্দরী দেবীকে আলী আকবর মা সম্বোধন করতেন। নজরুলের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তিনি নজরুলেরও মা হয়ে উঠলেন। সেনগুপ্ত পরিবারে অচিরেই নজরুল হয়ে ওঠেন প্রিয়ভাজন। বিরজাসুন্দরী দেবীর স্বামী, পুত্র ও দুই কন্যা ছাড়াও পরিবারে থাকতেন বীরেন্দ্রকুমারের জ্যাঠাইমা গিরিবালা দেবী ও তাঁর একমাত্র কন্যা আশালতা ওরফে প্রমীলা। কুমিল্লায় কিছু দিন থাকার পর নজরুল আলী আকবরের সঙ্গে তাঁদের দৌলতপুরের বাড়িতে যান। সেখানে আলী আকবরের বিধবা অগ্রজার মেয়ে সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ও অল্প সময়ের মধ্যে প্রণয়ের সূত্রপাত হলে আলী আকবর উভয়ের বিবাহের উদ্যোগ নেন। ভাগ্নীকে নজরুলের উপযুক্ত করে গড়ে তোলায় মনযোগী হন তিনি। সৈয়দা খাতুনের নতুন নামকরণ করা হয় নার্গিস আসার খানম। ১৮ জুলাই ১৯২১(৩ আষাঢ়, ১৩২৮) বিবাহের তারিখ নির্ধারিত হয়। বিবাহের কাবিন নামায় একটি শর্ত ছিল নজরুলকে ঘর জামাই থাকতে হবে। আত্মসম্মানী নজরুল সম্পর্কের এই জবরদস্তি বাঁধন প্রস্তাব মানতে পারেননি। বিয়ের মজলিশ থেকে চলে আসেন কুমিল্লায় মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী

দেবীর কাছে। এই পরিবারের কন্যা প্রমীলার সাথে তিন বছর পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন তিনি। কুমিল্লায় কয়েক দিন অতিবাহিত করে নজরুল চলে আসেন কলকাতায়, এসে বন্ধু মুজফ্‌ফর আহমেদের তালতলা লেনের বাসায় থাকতে শুরু করেন। ১৯২১ এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে এই বাসাতেই রচনা করেন সারা বাংলায় আলোড়ন ফেলে দেওয়া আত্মচৈতন্যের জাগরণের কবিতা, সর্ব প্রকার বন্ধন মুক্তির কবিতা 'বিদ্রোহী' । 'বিদ্রোহী' কবিতার অন্যতম পটভূমিকায় নার্গিসের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রসঙ্গের কথা 'নজরুল পরিক্রমা' গ্রন্থে আবদুল আজীজ আল আমান উল্লেখ করে গেছেন। 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসে 'বিদ্রোহী'র আত্মপরিচয়ের সাথে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি বিবাহের চূড়ান্ত প্রস্তুতির মুহূর্তে উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র নূরুর পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে হতে পারে। কিন্তু এই ঘটনার পূর্বেই 'বাঁধন- হারা' রচনার সূত্রপাত। সে ক্ষেত্রে সেনাশিবিরে যোগদানের প্রাক্‌কালে কোন অনুচ্চারিত প্রেমের বাঁধন ছিন্ন করার গোপন স্মৃতি ছিল কিনা তা সূক্ষ্ম গবেষণার বিষয় হতে পারে।

'বাঁধন-হারা'র প্রথম পত্রটি নূরুল হুদার করাচি সেনানিবাস থেকে বন্ধু রবু ওরফে রবিউলকে লেখা। চিঠিটি এমন ভাবে লেখা মনে হবে সুদুর করাচিতে বসেও নজরুল বন্ধুদের খবর তারহীন বার্তাবাহকের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন। নূরুর রসিকতা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, প্রাণোচ্ছলতা, সংগীত প্রিয়তা প্রমাণ করে নূরুর নামের আড়ালে আত্মগোপন করে আছেন নজরুল। নজরুল চির রোমান্টিক। নূরুল যখন বলেন, 'তোমার অভিমানের খাতির বেশী, না, আমার বুকের-পাঁজর দিয়ে ঘেরা হৃদয়ের গভীরতম তলে নিহিত এক পবিত্র স্মৃতিকণার বাহিরে প্রকাশ ক'রে ফেলার অবমাননার ভয় বেশী, তা' আমি এখনো ঠিক ক'রে বুঝে উঠে পারি নি'। তখন এক শুদ্ধ প্রেমিকের গুপ্ত প্রেমের সুপ্ত অমৃতময় স্মৃতিকে গোপনে ধরে রাখার আকুলতা অনুভব করা যায়। পরের চিঠি পরের দিন একি স্থান থেকে বন্ধু মনুয়ারকে লেখা। আগের দিন রাতে প্রবল ঝড় বৃষ্টির কারণে সকালে বাঙালি পল্টনে প্যারেড বন্ধ। সকাল হতেই গানের ফোয়ারা চলছে। হাবিলদার পাণ্ডে মশাই 'হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে, সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে'- এই গান মধুর গম্ভীর কণ্ঠে ধরলে নূরুলের মনের বীণায় 'সুপ্ত ঘায়ে যেন বেদনার মত গিয়ে বাজলো'। নূরুল আরও বলেন, 'আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যেন আমারই হৃদয়ের লুকানো সুপ্ত কথাগুলি ঐ গানের ভাষা দিয়ে এই বাদল রাগিণীর সুরের বেদনায় গ'লে প'ড়ছিল'। নূরুল হুদার হৃদয়াকুলতা আসলে নজরুলের নিজের ভিতরকার 'আমি'কে মেলে ধরার একটা সহজ কৌশলমাত্র। এই উপন্যাসের দ্বাদশ পত্রটি মাহবুবাকে লিখেছে রাবেয়া, যাকে নূরু ভাবী সম্বোধন করেছে। সেই রাবেয়ার স্বীকারোক্তির মধ্যেও গোপন প্রেমের মাধুর্য ছড়িয়ে আছে। রাবেয়া লিখেছে, 'সত্যি বলতে কি, তোর এই সোজা মানুষ ভাইটিকে (নূরুকে) ক্রমেই আমার বেশ ভালো লাগতে

> রবিয়ল এক জায়গায় লিখেছে, 'আমার মনে তোরই মত একটি চিরশিশু জাগ্রত ছিল, সে আজ বাঁধা পড়ে' তার সে সরলতা চঞ্চলতা আর আকুলতা ভুলে গিয়েছে'। এই চিঠিতেই রবিয়ল আরও বলেছে, 'তুই বাইরে এত সরল, এত উদার, এমন শিশু হয়েও যেন কোনএক বিপুল ঝঞ্ঝা'। এতো রবিয়লের কলমে নজরুলের আত্মস্বভাবের প্রকাশ। এই নজরুল তাঁর চূড়ান্ত আত্মঘোষণার কবিতা 'বিদ্রোহী'তে বলেন, 'আমি চির- শিশু, চির-কিশোর,/আমি যৌবন ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচুলি নিচোর'।

লাগলো। বিশেষ করে ওঁর কণ্ঠ ভরা গান আমার কানে বড্ডো মিষ্টি শুনাত। পরে জেনেছি এই ভাল লাগাটাই হচ্চে পূর্বরাগ। এখন মনে হয় পুরোপুরি ভালোবাসার চেয়ে এই পূর্বরাগের গোলাবী রাগটারই মাদকতা আর মাধুর্য বেশী'। রাবেয়া এ কথাও লিখেছে, 'আমাদের বিয়ে হবার পর এই সত্যবাদী ভদ্রলোক মুক্তকণ্ঠে আমার কাছে স্বীকার ক'রে ছিলেন যে, ' কোন দিন বা ঈষৎ আবছা চোখের চাওয়ায়, অভাবে কোন দিন বা চাবির রিং- এর বা রেশমি চুড়ির রিণিঝিণি — এই রকম যত সব ছোটোখাটো পাওয়ার আনন্দেই তিনি একেবারে রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝারে তাঁর হৃদয় হারিয়ে ফেলেছিলেন!' এই প্রেমের আবেগই ছিল নজরুলের জীবনের অন্যতম চালিকা শক্তি। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুল তাই অকপটে বলতে পারেন, 'আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম- উদ্দাম, আমি ধন্যি!' কিংবা 'আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল- করে দেখা- অনুখন,/আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তা'র কাঁকন চুড়ির কনকন'।

তৃতীয় পত্র নূরুকে লেখা রবিয়লের পত্র। রবিয়ল এক জায়গায় লিখেছে, 'আমার মনে তোরই মত একটি চিরশিশু জাগ্রত ছিল, সে আজ বাঁধা পড়ে' তার সে সরলতা চঞ্চলতা আর আকুলতা ভুলে গিয়েছে'। এই চিঠিতেই রবিয়ল আরও বলেছে, 'তুই বাইরে এত সরল, এত উদার, এমন শিশু হয়েও যেন কোনএক বিপুল ঝঞ্ঝা'। এতো রবিয়লের কলমে নজরুলের আত্মস্বভাবের প্রকাশ। এই নজরুল তাঁর চূড়ান্ত আত্মঘোষণার কবিতা 'বিদ্রোহী'তে বলেন, 'আমি চির- শিশু, চির- কিশোর,/আমি যৌবন ভীতু পল্লীবালার আঁচড় কাঁচুলি নিচোর'। এই চিঠিতেই রবিয়ল লিখেছে, 'যখনই মনে করেছি, এই তোর মনের নাগাল পেয়েছি, অমনি তোর গতি এমন উল্টো দিকে ফিরে যায় যে, আমি নিজের বোকামিতেই নিজেই না হেসে থাকতে পারি নে। এই তোর যুদ্ধে যাবার আগের কথাটাই ভেবে দেখ! — আমার যেন এক দিন মনে হ'ল যে, সোফিয়ার সই মাহবুবাকে দেখে তুই মুগ্ধ হয়েছিস। তার সঙ্গে তোর বিয়ের সব ঠিক-ঠাক করলাম, এমন সময় হঠাৎ একদিন তুই যুদ্ধে চলে গেলি। আমার ভুল ভাঙলো, অনেকের বুক ভাঙলো'। এই চিঠিতেই মন্তব্য করা হয়েছে, 'তুই ছাড়া- হরিণ! তাই কোন বাঁধন তোকে বাঁধতে পারে না'। নজরুল প্রথম যৌবনেই বুঝেছিলেন তিনি চির বন্ধন অসহিষ্ণু। কোথাও বাঁধা পড়া তাঁর স্বভাব বৈশিষ্টের বিরুদ্ধ। বিদ্রোহী'তেও এই সদর্প ঘোষণা আছে, 'আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল'। এই পত্রের শেষে রবিউল চোখে নিজের মূল্যায়ন করেছেন এই ভাবে, 'তুই বাস্তবিকই সুক্তি, উপরটা ঝিনুকের শক্ত খোসায় ঢাকা আর ভিতরে মাণিক'। বাইশ বছরের নজরুল বুঝেছিলেন তিনি রত্নসম্ভব।

নজরুল তাঁর স্বভাবের আন্তরিক বিশিষ্টতায় কুমিল্লায় বন্ধু বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের মা বিরজাসুন্দরীর কাছ থেকে মাতৃস্নেহ লাভ করেন। 'বাঁধন হারা'র চতুর্থপত্রটি রবিয়লের মা রকিয়া নূরুকে দিয়েছেন। চিঠির শেষে লেখা 'শুভাকাঙ্ক্ষিণী তোর মা'। এই চিঠিতেও 'মা' আক্ষেপ করে লেখেন, 'দু এক সময় তোর ছেলেমী আর ক্ষ্যাপামী দেখে খুবই বিরক্ত হতাম, কিন্তু ঐ বিরক্তির মধ্যে যে কত স্নেহ ভালবাসা লুকানো থাকতো, তোরা ছেলে মানুষ তা' বুঝতে পারবি নে'। এই চিঠিতেই এই মন্তব্য আছে, 'তোর কিন্তু 'কথার ফোয়ারায় ফিং ফুটে যেত'। উপন্যাসের ত্রয়োদশ পত্রটি মাহবুবার মা আয়েশাকে লিখেছেন রকিয়া। সে চিঠিতেও নূরুর যে স্বভাব পরিচয় আছে তা যে আমাদের চির চেনা নজরুলের স্বভাব চরিত্রের চিত্রণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রকিয়া লিখেছেন, ' আমি ওকে খুব ভালো ক'রেই চিনেছিলাম যে ও আমার বাউল উদাসীন ছেলে। রবু (রবিয়ল) সংসারী হ'য়ে ছেলে- মেয়েদের পেয়ে হয়তো বুড়ো মাকে আর মনে ক'রবে না, কিন্তু চিরদিন থাকবে আমার কোল ঠাণ্ডা ক'রে, এই চির-শিশু নূরু — এই ঘর ছাড়া উদাসী ছেলে আমার!' 'বিদ্রোহী' কবিতার একাধিক চিত্রকল্পে নজরুলের মুক্ত বাউল স্বভাবের উল্লেখ আছে, যেমন- 'আমি নৃত্য পাগল ছন্দ, /আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ!' কিংবা 'আমি উন্মন মন উদাসীর'।

পঞ্চম চিঠি মনুয়রের লেখা নূরুল হুদাকে। এই চিঠিতে বকলমে নজরুল রসিকতার ছলে যে বিষয়ের অবতারণা করেছেন তা এই উপন্যাস রচনার বেশ কয়েক বছর পর থেকে বাংলা সাহিত্যে চর্চায় দীর্ঘ দিন আলোচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বুদ্ধদেব বসু 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, 'রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনি (নজরুল) প্রথম মৌলিক কবি'। নজরুলের প্রথম কাব্য যখন প্রকাশিত হয়নি

তখনি নজরুলের এই আত্মপ্রত্যয় তৈরি হয়ে যায়, এটা বিস্ময়কর। মনুয়র বোডিং এর বন্ধু মহলে নূরুকে নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখে "তুই একটা প্রকাণ্ড 'হবু কবি' বা কবি-কিশলয়! তোর যে ভবিষ্যত দস্তুর মত 'ফর্সা' এবং ক্রমেই তুই যে রবি বাবুর "নোবেল প্রাইজ" কেড়ে না নিস অন্ততঃ তাঁর নাম রাখতে পারবি, এ সিদ্ধান্তে সকলে একবাক্যে সম্মতিসূচক ভোট দিয়েছেন'। মনুয়রের কলম দিয়ে নিজেকে নিয়ে একটু পরিহাসও করিয়ে নিয়েছেন। মনুয়র লিখেছে— 'কবির চেয়ে কপির (অর্থাৎ বানরের) উপাদানই তোর মধ্যে বেশী"।

নূরুকে লেখা রাবেয়া ভাবীর প্রথম পত্রে জানা যায়, নূরু স্কুল যাওয়ার চেয়ে মিশন সেবাশ্রমেই বেশি ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করত। রাবেয়ার প্রথম প্রথম মনে হত নূরুর মাথায় লম্বা চুল, মাঝে মাঝে গেরুয়া বসন একটা উদাসী ভাব, একটা উৎকট পাগলামি বা ফ্যাসান। কিন্তু এই পিতৃমাতৃহীন যুবকটি যে দিন অসঙ্কোচে কাছে এসে দাঁড়াল সে প্রসঙ্গে রাবেয়া লিখেছেন— 'তোমার ঐ নির্বিকার ঔদাস্যের ভাসা ভাসা করুণ কোমল দৃষ্টি আর শিশুর মন, অনাড়ম্বর সহজ সরল ব্যবহার দেখে আপনি তোমার ওপর একটা মায়া জন্মে গেল'। বলার অপেক্ষা রাখে না নূরুর এই ভাব ও বৈশিষ্ট্য আসলে নজরুলকে কাছের মানুষেরা যে ভাবে দেখতেন এ তারই বর্ণনা। মিথ্যা আশা দিয়ে মাহবুবা থেকে নূরুর সরে যাওয়া রাবেয়া মেনে নিতে পারেননি। দীর্ঘ অভিযোগ আছে পত্রে। শেষের দিকে রাবেয়া লিখেছেন, ' আমার খুবই আশা ছিল, তার রূপ গুণের ফাঁদে প'ড়ে তোমার মতন সোনার হরিণও ধরা দেবে, তোমার এই লক্ষ্যহীন, বিশৃঙ্খল বাঁধন-হারা জীবনের গতিও একটা শান্ত সুন্দরকে কেন্দ্র ক'রে সহজ স্বচ্ছন্দ ছন্দে বয়ে যাবে'। নজরুলের জীবনে প্রেম এসেছে বার বার, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি তাকে নীরবে পীড়িত করত তার প্রমাণ রাবেয়ার পত্র। 'বিদ্রোহী'তে বিভিন্ন ভাবে নজরুলের এই স্বীকারোক্তি আছে, - 'আমি কভু প্রশান্ত, - কভু অশান্ত, দারুণ স্বেচ্ছাচারী' কিংবা 'আমি উন্মন মন উদাসীর,/আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর!'। অথবা 'আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি'। নজরুল তাঁর স্বভাবের বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন।

সপ্তম পত্রটি শোফিকে লেখা তার 'কলমি লতা' মাহবুবার পত্র। এই পত্রের একটি অংশে ধর্মীয় বিধান আর নারীর অসহায়তা বিষয়ে যে মতামত লিখিত হয়েছে, তা আসলে নজরুলের সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত আধুনিক মননের প্রতিচ্ছবি। মাহবুবা লিখছে, 'খোদা- না- খাস্তা একটু ঠোঁট নড়লেই মহাভারত অশুদ্ধ আর কি। বাবা আদমের কাল থেকে ইস্তকনাগাদ নাকি আমরা ঐ দাসী বৃত্তিই করে' আসছি। কারণ হজরত আদমের বাম গায়ের হাড্ডি হতে প্রথম মেয়ের উৎপত্তি। বাপরে বাপ। আজ সেই কথা টলবে? এ-সব কথা মুখে আনলেও নাকি জিভ খসে পড়ে'। 'বাঁধন-হারা' রচনার শতবর্ষ পরেও ধর্মীয় ডগমার নিয়ে কথা বলার পরিস্থিতি আসেনি। নজরুল সেদিন এই প্রশ্ন তুলেছিলেন, ভাবলে অবাক হতে হয়। নজরুল সম্ভবত প্রথম বাংলায় নারী স্বাধীনতা বিষয়ে সোচ্চার হন, 'নারী' কবিতায় তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, 'আমার চক্ষে পুরুষ- রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!/বিশ্বে যা-কিছু মহানসৃষ্টি চির-কল্যাণ-কর/অর্ধেক তাঁর করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'। মাহবুবা লিখেছে— 'তোমরা একটু উদার হও, একটু মহত্ত্ব দেখাও এতদিনকার (এইসব) একচোখা অত্যাচারের সঙ্কীর্ণতার খেসারতে এই এক বিন্দু স্বাধীনতা দাও, - দেখবে আমরাই আবার তোমাদের নতুন শক্তি দেব, নতুন করে' গড়ে' তুলব'। সাম্যবাদী নজরুল পুরুষতন্ত্রের নিগড় থেকে নারী সমাজকে মুক্ত করার বিষয়ে প্রাক্ যৌবনেই যে সোচ্চার ছিলেন মাহবুবার পত্র তার আর এক দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি নারীর কল্যাণময়ী রূপের গুরুত্বকে হৃদয়ের গভীরে স্থান দিয়েছিলেন নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় নতুন সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্নদ্রষ্টা নজরুল। এই পত্র-উপন্যাসের ষোড়শ পত্রটি রেবা অর্থাৎ রাবেয়াকে লিখেছে সই সাহসিকা। সাহসিকার কলমে নজরুলের সমাজ দর্শনই ভাষা রূপ পেয়েছে—'নারীই যদি পাষাণী হ'য়ে যায়, তবে যে বিশ্ব সংসার থেকে লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্তিই উবে যায়, আর বিশ্বও তখন কল্যাণ হারা হয়ে তৈলহীন প্রদীপের মতই এক নিমেষে নিবে গিয়ে অন্ধকার হ'য়ে যায়! এই কল্যাণী নারীই বিশ্বের প্রাণ!'

নবম পত্রটি নূরুল হুদা করাচি সেনা নিবাস থেকে লিখেছে ভাবী সাহেবাকে। সেখানে নূরুল হুদা নিজেকে বলেছে

'নর-পিশাচ' আর সরাসরি নিজেকে সৃষ্টিকর্তার প্রতিস্পর্ধী রূপে ঘোষণা করে বলেছে— 'মানুষকে আঘাত করে' হত্যা ক'রেই আমার আনন্দ! আমার এ নিষ্ঠুর পাশবিক দুষমনী মানুষের ওপর নয়, মানুষের স্রষ্টার ওপর। এই সৃষ্টি কর্তা যিনিই হন, তাঁকে আমি কখনই ক্ষমা ক'রতে পারবো না'। এই ঘোষককে আপাতত নৈরাজ্যবাদী বলে মনে হতে পারে। আসলে এ মানসিকতা এক ভয়ংকর অস্থিরতার দ্যোতক। 'বিদ্রোহী'তেও স্রষ্টার বিরুদ্ধে এই দ্রোহ ধ্বনিত হয়েছে — 'আমি মানব দানব দেবতার ভয়, বিশ্বের আমি চির- দুর্জয়' কিংবা 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে, এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!/আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন'।

মনুয়রের লেখা দ্বিতীয়পত্রটি বা এই গ্রন্থের দশম পত্রটি 'কবি-সৈনিক' নূরুকে লেখা। নূরুর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য এই পত্রে আছে। পত্রের প্রথম পর্বেই অনুযোগের স্বরে মনুয়র বলে, 'তোর স্বভাবই হ'চ্চে লোকের সঙ্গে কর্কশ বেয়াদপী করা আর মুখের ওপর নির্মম প্রত্যুত্তর করা'। বলা বাহুল্য এ হল নজরুলের স্বভাবেরই একটা দিক। এই চিঠিতে নূরুর প্রাণ খোলা হাসি আর কথায় কথায় উদাত্ত কণ্ঠে গান গেয়ে ওঠার চিত্র আছে। সবাই জানি এ ছিল নজরুলের একান্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্য। 'বিদ্রোহী'তে নজরুল কখনো বলেছেন —'আমি চপলা —চপল হিন্দোল' , কখন ' আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!' এই চিঠিতে মনুয়র নূরুকে এক জায়গায় বলেছে, 'তোর মতন বিপুল অভিমানী যে কারুর স্নেহ যাচঞ্জা করে না, তা আমি জানি। আমি আরো জানি, তোদের মত অভিমানীদের আত্মসম্মান জ্ঞান আর দুর্বলতা ধরা পড়বার ভয়, ভয়ানক তীক্ষ্ণ সজাগ'। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নজরুলের স্বীকারোক্তি আছে, 'আমি অভিমানী চির- ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়'।

নজরুলের রঙ্গরসিকতা বন্ধু মহলে ছিল সুবিদিত। মনুয়রকে লেখা নূরুর চিঠিতে যে প্রগলভ রসিকতার বিচ্ছুরণ আছে তার উল্লেখে আমরা নজরুলের এই বিশেষ দিকটির পরিচয় পেতে পারি। এই উপন্যাসের একাদশ পত্রটি করাচি সেনা- নিবাসের শ্রীঘর থেকে চিঠির প্রত্যুত্তরে মনুয়রকে লেখা; সম্বোধনেই হতচকিত হওয়ার ব্যাপার। 'স্বেচ্ছচারী- নূরুল হুদা' বন্ধুকে সম্ভাষণ করেছে —' বাঁদর মনো' বলে। তারপর লিখেছে— 'শুয়োর পাজি- ছুঁচো উল্লুক- গাধা ড্যাম- ব্লাডি- ফুল- বেল্লিক বেল্লেল্লা উজবক বেয়াদব- বেতমিজ। - ওঃ, আর যে মনে প'রছে না ছাই, নৈলে এ চিঠিতে অন্য কিছু না লিখে শুধু হাজার খানেক পৃষ্ঠা ধ'রে তোকে আষ্টে-পিষ্ঠে গা'ল দিয়ে তবে কখনো ক্ষান্ত হ'তাম। তুই বিছুটি- আল কুসি- লাগানো ছাগলের মতন ছুটে বেড়াতিস — আর তবে না আমার প্রাণের জ্বালা হাতের চুলখুনী কতকটা মিটতো!' নূরু এ কথাও লেখে, 'চিঠি-পত্র বন্ধ ক'রলে বা খবর না পেলে যে খুব বেশী চিন্তিত হব তা ভুলেও মনে করিসনে যেন। মনে রাখিস দুনিয়া যদি হয় বুনো ওল, তবে আমি বাঘা তেঁতুল'।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলন আকাঙ্ক্ষা নজরুলের জীবন সাধনায় এক অবিচ্ছেদ্য বিষয়। এই পত্রোপন্যাসের দ্বাদশ পত্রে রাবেয়া মাহবুবাকে সমাজে নারীর অবস্থার কথা বলতে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের নারীদের 'উদারতা সরলতা সমপ্রাণতা' ও 'প্রীতিভরা ব্যবহার' কীরকম নিবিড় প্রশান্তি আনে তা উল্লেখ করেছেন। আর সেই সূত্রে এসেছে হিন্দু মুসলমান প্রসঙ্গ। রাবেয়া লিখেছে, 'আমাদের ঘরের পাশের হিন্দু ভগিনীগণ যখন এমনি করে মিশতে পারবেন, তখন একটা নতুন যুগ আসবে দেশে এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি, এই ছোঁয়াছুঁয়ির উপসর্গটা যদি কেউ হিন্দুসমাজ থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন, তা হ'লেই হিন্দু মুসলমানের এক দিন মিল হ'ইয়ে যাবে।' রাবেয়ার জবানিতে এই সমাজ নিরীক্ষণ তো আসলে সেদিনের প্রেক্ষিতে চিরমিলনাকাঙ্ক্ষী নজরুল মানসেরই প্রতিচ্ছবি।

এই উপন্যাসের ষোড়শ পত্রটি রেবাকে সাহসিকা লিখেছে। সাহসিকা নূরুকে যেভাবে দেখেছে তা পড়তে পড়তে মনে হবে এতো 'বিদ্রোহী' কবিতার ব্যাখ্যান। 'বাঁধন- হারা' আর 'বিদ্রোহী' যেন একই ভাবনার দুই ভিন্ন প্রকাশরূপ মাত্র। বিশিষ্ট শব্দ, চিত্রকল্পগুলি হুবহু গদ্য আর পদ্যে অনায়াসে যাতায়াত করেছে। গদ্য পড়তে পড়তে পদ্যের লাইনগুলো চোখের সামনে সহজেই ভেসে ওঠে। সাহসিকা লিখেছে, 'যার রক্তে রক্তে বাঁধন হারার ব্যাকুল ছায়ানটের নৃত্য চপলতা আর শিরায় শিরায় পূর্ণ তেজে নট নারায়ণ রাগের ছন্দ মাতন হিন্দোল দোল

আরো আকুল চঞ্চলতা জাগিয়ে দেওয়া আরো বিপুল দোল উন্মাদনায় দুলিয়ে দেওয়া!' 'বিদ্রোহী'তে এর প্রতিধ্বনি আছে- 'আমি নৃত্য পাগল ছন্দ,/ আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ!/ আমি হাম্বির, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল'। সাহসিকার বকলমে নজরুল লিখেছেন—' সে যে চির উদাসী চিরবৈরাগী! সৃষ্টির আদিম দিনে এরা সেই যে ঘর ছেড়ে বেড়িয়েছে, আর তারা ঘর বাঁধলো না। ঘর দেখলেই এরা বন্ধন-ভীতু চখা হরিণের মতন চমকে ওঠে! কোন গহন-পারের বাঁশী যেন এরা শুনছে আর শুনছে। এরা এমনি ক'রে চিরদিনই ঘর পেয়ে ঘরকে হারাবে আর যত পরকে ঘর ক'রে নেবে!'। সাহসিকা আরও লিখেছে, 'এ ছেলে বাঙলাতে জন্ম নিলেও বেদুইনদের দুরন্ত মুক্তি- পাগলামি, আরবীদের মস্ত পোদর্দা আর তুর্কীদের রক্ততৃষা ভীম স্রোতাবেগের মত ছুটছে এর ধমনীতে ধমনীতে'। বিদ্রোহী' তেও এই ঘোষণা আছে- 'আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস' কিংবা 'আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!'

সাহসিকার কলমে এই ষোড়শ পত্রেই 'বিদ্রোহী' প্রসঙ্গের প্রত্যক্ষ অবতারণা করে বলা হয়েছে, 'বাধন-হারা নূর যেন বিশ্বমাতার বড় স্নেহের দুলাল- ঠিক 'কোল পোঁছা' ছেলের মতন আবদেরে' একজিদ্দে একরোখা আর তোদের কথায় বিদ্রোহী!'। রাবেয়াকে সাহসিকা জানিয়েছে, নূরুকে স্রষ্টার বিদ্রোহী বলে ধরে নিলে ভুল হবে, কারণ উন্মাদ যৌবনের রক্তহিল্লোলে 'সে হয়তো অনেক কথা বুঝেই বলে, আবার অনেক কথা না বুঝে শুধু ভাবের উচ্ছাসেই ব'লে ফেলে!'। এই পত্রেই বলা হয়েছে 'বিদ্রোহীটা তো অভিমান আর ক্রোধেরই রূপান্তর'। আরও উল্লেখ্য যে, 'এ সব ছেলেকে বুঝতে হলে এদের আদত সত্য কোনখানে, সেইটেই সকলের আগে খুঁজে বের করতে হবে'। এই সত্য সন্ধান প্রসঙ্গেই এসেছে ধর্মের চিরন্তন সত্যের প্রসঙ্গ। সাহসিকা চিঠিতে লিখেছে, 'সত্যকে যে অহরহ এই আস্তিকের দল প্রতারণা ক'রছে, এ ভণ্ডামী কি তারা নিজেও বোঝে না? মন্দিরে গিয়ে পূজা করা আর মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়াটাই কি ধর্মের সার সত্য? এগুলো তো বাইরের বিধি'। সে বলেছে 'ভণ্ড আস্তিকদের চেয়ে নাস্তিকদের বেশী পক্ষপাতী'। কারণ 'এরা বিবেকের বিরুদ্ধে কথা বলে না'। আর ভণ্ড আস্তিকদের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কারে সাহসিকা বলেছে, 'মিথ্যার কি জঘন্য অভিনয় ধর্মের নামে- সত্যের নামে! ঘৃণায় আপনিই আমার মন কুঁচকে আসে'। গোঁড়া ধার্মিকেরা ধর্মের আসল সত্যটা না ধরে এরা অন্ধভাবে চিরাচরিত নৈমিত্তিক বিধি বিধান নিয়ে ব্যস্ত। তারা প্রশ্নহীন আনুগত্য চায়। এখানেই সাহসিকার তীব্র আপত্তি। সাহসিকার এই যুক্তিবাদী নির্মোহ মানসিকতার প্রকাশে আসলে নজরুল মানসের প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত হতে দেখি।

'বাঁধন- হারা'র প্রতিটি পত্রের কেন্দ্রে থেকেছে একটিমাত্র চরিত্র বা তার ক্রিয়াকলাপের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা। সেদিক থেকে এটি একটি সরল বুনটের উপন্যাস। চিঠির পর চিঠি সাজিয়ে একটি আধুনিক মননের উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব অবশ্যই নজরুলের প্রাপ্য। তবে 'বাঁধন-হারা' উপন্যাস আর 'বিদ্রোহী' ভাবধারার প্রকাশ যেন একে অপরের সম্পূরক। প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহী' যেমন বিপরীত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে প্রখর আত্মশক্তির জাগরণ, নূরুল হুদাও তেমনি প্রচলিত সব ধ্যান ধারণা ভেঙে মহা বিদ্রোহী। চলিষ্ণুতাই তার ধর্ম; সে কারণেই বাঁধন হারা। উপন্যাস এবং কবিতার ভাব ও ভাষার আশ্চর্য মিলন নূরুল হুদার মধ্যে নজরুলের আত্মপ্রতিকৃতি হুবহু ধরা দেয়। এখানেই 'বাঁধন-হারা'র অনন্যতা।

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ প্রকাশনা

সোহরাওয়ার্দী পরিবার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার—আলিমুজ্জমান

নেপথ্য নায়ক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন—খন্দকার মাহমুদুল হাসান (জীবনীমালা-১)

মৌলবি মুজিবর রহমান ও 'দ্য মুসলমান'—মিলন দত্ত (জীবনীমালা-২)

ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী ও বাংলার নবজাগরণ—সামশুল আলম (জীবনীমালা-৩)

নূরন্নেছা খাতুন রচনা সমগ্র—মীর রেজাউল করিম (প্রকাশিতব্য)

চরিতাভিধান বাংলার মুসলমান সমাজ—সম্পাদকমণ্ডলী (প্রকাশিতব্য)

মহম্মদ বাকী বিল্লাহ মণ্ডল

মহাজাগতিক এজলাসে

প্রারম্ভিক প্রত্যুষে মেঘের পাহাড় টপকে টপকে
পাকা তেলাকুচো ফলের মতো অমলিন সূর্যের লাল লাল আলো
মায়ের মায়ার মতো ঝরে পড়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন শিশুর মুখের মতোন পৃথিবীর বুকে,
দিগন্ত বিস্তৃত শান্ত সমাহিত মরুভূমির নরম বালির ক্যানভাসে।
প্রকৃতির তুলিতে সেখানে কতো সব ছবির আঁকিবুকি,
দূরে - সুদূরে মহাসমুদ্রের উথাল - গর্জন।
কোথাও বা মরুদ্যানের মায়াবী রূপজাল;
মৃদু পায়ে আড়ষ্ট ভাঙা কাফেলার দল ,
পিছে পিছে তার মরীচিকার - কুহকে সাংসারিক যাযাবর।
বালিতে প্রস্ফুটিত বিচ্ছিন্ন সেইসব ছবি
খেয়ালি চিত্তে জুড়ে জুড়ে পূর্ণাঙ্গ অবয়ব দিচ্ছে একটি পাগল।
দিলখুস মনে পাগলটি হাসছে - শুধুই হাসছে,
তার গোঁফ - দাড়ির জঙ্গলে প্রায় ঢেকে যাওয়া মুখে ঠিকরে পড়ে ঝলমলে কোজাগরি চাঁদ।
পাগলটি মানুষের বুকে প্রতিস্থাপন করলো জীবনের হৃৎপিণ্ড,
গড়ে তুললো দ্বন্দ্বময় আইনের বিশালাকার কিতাব,
হাল আমলের ছানি চোখো ধর্মাবতারের সাজানো এজলাস।
বিচারের কাঠগড়া ভেসে যায় ...
সুজাতা, ডি'সুজা , নার্গিসের ছেঁড়া কলিজার তাজা রক্তের প্রস্রবনে।
হতবাক পাগলের চোখে নীরব ধারা শুকনো পাতার মতোই ঝরে পড়ে নিঃশব্দে ।...
সর্বহারার অন্তহীন মাতম আর পাগলের আগুন - চোখের জ্বলন্ত মোমের উষ্ণ স্রোত
মিলেমিশে একাকার,
ভেসে যায় মহাসাগরের উত্তুঙ্গ ঢেউয়ের প্রলয়ে।

আবদুস সালাম

সেলফি

নৈরাশ্যের সাথে আঁতাত করতে করতে আঁশটে গন্ধ মেখে নিচ্ছি রোজ
সভ্যতার বহুচারী জীবনে আত্মবোধ মেনে নিঃশব্দ সংলাপ:

শূন্যতার পিচ্ছিল ছায়ায় কমে আসে আমাদের দৈর্ঘ্য
মোহময় নীল প্রেমের ঠোঁটে ঝুলছে উপবাসী বিরহী সংগীত
আয়োজনহীন অকপট আর্তনাদ প্রকট হলে মুখে মেখে নিই ব্যাকুল দীর্ঘশ্বাস

মোমগলা উষ্ণতায় কাটে ঘুমহীন রাত

এসো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই
দেখবো শৈশবের মতো হিংসা বর্জিত সাদা মুখ
ঝেড়ে ফেলি উজ্জ্বল ছদ্মবেশ

রাতের ভাঁজ খুলে দেখে নিই আত্মকাহিনীর সেলফি
যেখানে গুমোট পৃথিবীর লোনা ঘামে দগ্ধ বাতাসেরা
অপ্রিয় কথামালার ছবি আঁকে

জু ল ফি কা র খা ন
হিমভরা পৃথিবী

করোনার বিষাদময় দিন পেরিয়ে
যে শিশুর হল জন্ম,
যার দেহ করোনা বিষহীন
সে কি বার্তা নিয়ে এল গতিশীল নতুন পৃথিবীর।
তার ভাষা কে বোঝে—মিষ্টি ফুল, শিশুর মতো যারা।।
ফুল শিশুর চোখ দুটি কিন্তু ভ্যাপসা—
সে অনুভব আতঙ্কের গতিহীন হিমভরা পৃথিবীর গন্ধ।।
সে শান্ত হয়ে মহানাবিকের কথা ভাবে।
যে বলবে হে সুন্দর পৃথিবী তুমি হবে আশীষ আমাদের।।
আমার প্রতিজ্ঞা আজ,
দেহে থাকতে প্রাণ
দৌড়ে যাব-বিশ্বময়
আমার চাই হিমের বদলে গতিশীল আলোকময় পৃথিবী
আবার।।

ফি রো জা খা তু ন
রক্তাক্ত শ্রাবণ

বাইরে শ্রাবণ ভিতরে দহন,
ফিরে যায় কম্পিত চুম্বন
ঝরে পড়ে কদমের রেণু,
বুকে বাজে ক্রন্দন বেণু।

দুচোখে বয়ে যায় প্লাবন
এক শয়নে, অঘোষিত দূরত্ব----

বঞ্চিত জ্বালা মরমী মনে,
নিদ্রাহীন ইতিহাস অখন্ডিত।

আকুল মৌসুমী আকাশে
বিরহী চাঁদের বুকে, শ্রাবণ রক্তাক্ত।

সা হা রু খ মো ল্লা
বিচার

গতিময় পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে
সমাজ সংস্কৃতি বিরোধীদের দৌরাত্ম্য,
চন্দ্র সূর্য যেন তাদের স্বকীয়তা হারিয়েছে,
অভিশপ্ত অন্ধকারে পরিবেশ হচ্ছে বিষাক্ত।

পাষণ্ড দম্ভের কলুষিত স্পর্শে
নিভৃতে ক্রন্দনরত ধর্ষিতা!
অবলোকিত হচ্ছে কৌশল প্রণীত
মানবাধিকার সংস্থার ব্যর্থতা!

দানবীয় হিংস্রতার বিকাশে
নিঃশব্দে ঠুনকো হচ্ছে মমত্ববোধ,
গতানুগতিক চলচ্চিত্র প্রকাশে
ধর্মীয় উষ্কানি ভরপুর নির্বোধ।

সম্প্রীতির মহাভারতে প্রতিনিয়ত
কৌরব ঔদ্ধত্যপনায় পান্ডবদের পরাজয়,
নিষ্পেষিত গণমানুষের অধিকার
পাওনা যেন দুষ্প্রাপ্য দুর্জয়!

সাম্যবাদের বিশাল বিচরণ ভূমিতে
চলছে রাজনীতির দাবা খেলা,
দুর্যোধন-দুঃশাসনদের দুরাচারিতায়
ঘনীভূত হচ্ছে গাঢ় মেঘের ভেলা।

জাতিভেদ, ধর্ষণ, বর্ণবাদ
যেন চঞ্চল প্রকৃতির চিত্রনাট্য,
অশুভের চঞ্চল দৌরাত্ম্যপনায়
নির্দধিায় নিঃশেষ মানবিক ধনাঢ্য।

নির্জন গারদের কক্ষ গুলো
অশ্রুধারায় স্যাঁত স্যাঁতে,
ঘরদুয়ারের ফ্রেম এখনও অগ্নীদগ্ধ,
সর্বস্ব ক্ষুইয়ে, সর্বহারা বিকৃত বিচারের হাতে!

মুসলিমা বেগম

বিষাদের ঘর

আমার বিষাদের ঘর বেঁধেছি
তোর মনের অন্তঃপুরে।
অরণ্যের মাদকতা মিশেছে দিগন্তের
ঝাপসা কুয়াশায়।
প্রেম পিয়াসী বেহিসেবি মন স্মৃতির তহবিলে
জমা রেখেছে নতুন প্রেমের ভোর।
পাথরে থ্যাঁথলানো অভিমানের অঙ্কুরিত
কুঁড়ি গুলো ফুটেছে ভালোবাসার ফুলে।
মনের রাত্রিকে ছুঁইয়ে গেলো ভোরের স্নিগ্ধ
বাতাস। কুয়াশারা এখনো ছেয়ে আছে
মনের চারিদিক।

তোর শহর জুড়ে নগ্নতার সন্ত্রাস।
আমার ভালোবাসার চিলেকোঠায়
সীমানা থেকে তোর মনের উঠোন জুড়ে
শুধু শূন্যতার বিভীষিকা।
অপূর্ণতার আধার জুড়ে স্যাত স্যাতে
স্মৃতির আনাগোনা । নগ্ন মেঘের আড়ালে
বিষন্নতার ফুল ফুটেছে তোর ক্যাক্টাসের
বাগানে। তোর স্বপ্নের চুল্লিতে জ্বলে
আমার সাজানো ভালোবাসার চিতা।

দিনলিপি থেকে রোজ ঝরে পড়ে
অবিশ্বাসের বিষাক্ত বাতাস।
স্মৃতি চারণের শ্রাবণের দুপুরে তুই
আজও আছিস আমার কাব্যে।
সব অভিমান ভুলে মেঘের প্রচ্ছদ ছিঁড়ে
তৃষ্ণার্থ যৌবনের আঁধার কেটে আবারও কি
আমাদের দেখা হবে এই শহরে
কোনো এক নতুন ভোরে নতুন রূপে।

আতিয়ার রহমান

প্রিয় মাতৃভূমি

যদি বিরক্ত না হও
তাহলে কবিতা পাঠাতে পারি অহরহ
কবিতা আমার শাওনের মতো
আসে, বৃষ্টি-অবিরাম।
যদিও আহত-আমি, ব্যহত জীবন-যাপন।

চারিদিকে যা দেখি
দেশ, সমাজ ও কালের নানা অবক্ষয়
এসব দেখে বড় ভয় হয়।
ব্যথিত -মথিত করে ব্যাকুল আহ্বান।
মা আমার, তোমাকে ছেড়ে
আবার কোথাও চলে যেতে হবে না'ত-
আমার প্রিয় মাতৃভূমি?
সান্ত্বনা দেয় সবুজ বনানী ঘেরা- ছায়া সুনিবিড়।

গোধূলির অস্ত রাগে
গ্রাম্য আলপথে কাদা মেখে
দু'চোখ ভরে দেখি আমার শারদীয়া পল্লীপ্রকৃতি।
আর ...ও আর...ও হেঁটে চলি
নিকষ আঁধারে নিরবধি।।

সেখ রফিকুল ইসলাম

ঘূর্ণাবর্ত

১ : রাত দশটার ফোন

.....

ফোনে রিং হতেই দেখলাম unknown নাম্বার। ইচ্ছে করেই ফোন ধরলাম না। রিং হয়েই চলেছে–কেটে গেল। আবার দু-এক মিনিট পর– একই নাম্বার থেকে ফোন। খানিকটা বিরক্তি ভরেই ফোনটা ধরলাম।

ওপার থেকে :– কি রে-কেমন আছিস। ঘুমিয়ে পড়েছিলি না কি?

আমি :– না– এখনও জেগে আছি। আচ্ছা আপনি কে বলুন তো? কোথা থেকে বলছেন, আর কাকে চাইছেন?

ওপার থেকে :– আমি কি রফিকুলের সাথে কথা বলছি?

আমি :– হ্যাঁ আমি রফিকুল বলছি। আপনি কে বলছেন যদি দয়া করে একটু বলেন তাহলে কৃতার্থ হই।

ওপার থেকে :– হাঃ হাঃ হাঃ– আমি সঞ্জয় বকসি। চিনতে পারছিস?

আমি :– শালা এতক্ষণ পাঁয়তারা মারার কি দরকার ছিল?

সঞ্জয় :– তাহলে সারপ্রাইজ দিতাম কি করে?

আমি :– তা- পঞ্চাশ বছর পর আমার ফোন নম্বর পেলি কোত্থেকে! এখন আছিস কোথায়? ইত্যাদি-ইত্যাদি নানান বিষয়ে ফোনে প্রায় এক ঘণ্টার আলাপ। ওর বাড়ীতে যাবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিনকার মত ছুটি।

২ : অবুঝ ছেলে বেলা

স্কুল সহপাঠীদের মধ্যে যে চার পাঁচ জনের সাথে ঘনিষ্ট বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে সঞ্জয়, দেবাশীষ, কনক, রতন (মইদুল) কে এক বন্ধনীতে রাখা যেতে পারে। আমি সঞ্জয়, দেবাশীষ, শ্যামসুন্দরের স্কুল হোস্টেলে, আর মইদুল তথা রতন ও কনক পাশের গ্রাম বায়রা-সহজপুর থেকে যাতায়াত করতো। – যেটা লক্ষণীয় হল রতন ও কনকের সাদৃশ্য। একই রঙের প্যাণ্ট জামা একই রঙের পেন-খাতা, একই রঙের বইয়ের মলাট, একই বেঞ্চে পাশাপাশি দুজন, একই গ্রুপে খেলা ধূলা অর্থাৎ বহিরঙ্গে দুজনে দেখতে। আলাদা হলেও বলা চলে এরা দুজন জোড়মানিক। একই রঙের ব্যাগ, এমন কি হেয়ার স্টাইলও এক।

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে– আমাদের স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী থেকেই বিভিন্ন মনীষীদের নামে গ্রুপ ভাগ করে খেলাধূলা ও অন্যান্য সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হত। ঘটনাচক্রে কনক গেল স্বামীজী গ্রুপে আর রতন দেশবন্ধু গ্রুপে। আমরা অর্থাৎ সঞ্জয় দেবাশীষ ও আমি– রবীন্দ্র, নেতাজী, স্বামীজী গ্রুপে। কিন্তু ফল হল এই যে কনক মনমরা হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে আর রতনের চোখে জল। আমরা এ অবস্থা দেখে ওদের কষ্টের কারণ জেনে আশ্বস্ত করলুম, দাঁড়া দেখি কি করা যায়। স্যার কে গিয়ে বললাম- ওদের (কনক-রতন) দুজনকে একই গ্রুপে রেখেদিন– পরিবর্তে আমাদের একজন কে বদলা বদলি করে দিন।

যাই হোক- স্যারের সম্মতিক্রমে– ওদের কে এক গ্রুপে রেখে দেওয়ার আনন্দে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে সে কি যে উচ্ছ্বাস, তা আজকে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

৩ : বয়স সন্ধিক্ষণের চপলতা

আমাদের স্কুলে কো-এডুকেশন চালু ছিল না। আমরা সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকেই কো এডুকেশন চালু হল। মূলত মেয়েরা সকলেই পঞ্চমশ্রেণীতে ভর্ত্তি হল। যদিও দু-চারজন ভর্ত্তি হয়েছিল। ঐ বয়সে মেয়েদের সম্পর্কে আমাদের কোন আলাদা অনুভূতি তৈরী হয়নি, ফলে মেলা-মেশা, কথা-বার্তার মধ্যে কোনরকম অস্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বস্তি অনুভব করিনি।

তবে বছর বছর ক্লাসের গণ্ডী অতিক্রম করতে করতে ক্রমে ক্রমে বয়স বেড়েছে। সেই সঙ্গে বয়ঃসন্ধিতে এসে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটেছে। ছেলেদের যেমন গোঁফের রেখা দিয়েছে তেমনি মেয়েদেরও লক্ষণটি ভাবে বুকের মাপ বেড়েছে, ঢেকেছে ওড়না আবরণে। হয়তো তখন থেকেই মনের কোনে আদম-ইভের নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার ফল ফলতে শুরু করেছে।

কার কেমন চলার ভঙ্গী, কথা বলার স্টাইল, কার চোখের কেমন চাউনি, চোখের বিভিন্ন রকমের চাউনি কি ভাবের ইঙ্গিত করে—এসব বিষয়গুলি খুব সন্তর্পণে ও গোপনে আমাদের ক্লোজ বন্ধুদের সাথে আলোচনা চলতো। তা নিয়ে 'ক'বাবুর সাথে ম্যাডামের নাম যোগ করে স্কুলের দেওয়ালে বা প্রাচীরে লেখার সৎসাহস ছিল না। আর এ ব্যাপারে হোস্টেলে কোন রসিকা বৌদিও ছিল না যে আমাদের ঐ বয়সে এঁচোড়ে পাকিয়ে দিতে পারতো।

৪ : আমাদের আকাশে মৌসুমী বাতাস

আমরা তখন দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ। সবে মাত্র স্কুল খোলা হয়েছে। নূতন করে বিভিন্ন ক্লাসে ভর্ত্তি নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। একদিন দেখি এক মাঝ বয়সী গার্জেন তাঁর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের দিকে আসছেন। দু পাশে রতন ও কনকের সাথে কথা বলতে বলতে হাঁটছেন। পিছনে ফ্রক পরা নাইলন ফিতের ঝুটি বাঁধা মেয়েটি ও গুটি গুটি পায়ে হেঁটে চলেছে। স্কুল কম্পাউণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করতেই রতন ও কনক হেডমাষ্টার মশাইয়ের অফিস রুমটির দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে ক্লাস রুমে ঢুকে পড়ল। মৌসুমী ক্লাস নাইনে ভর্ত্তি হল।

তারপর প্রতিদিনই রতন ও কনকের সাথে মৌসুমীর স্কুল যাতায়াত। কোনদিন যদি মৌসুমীর আগে স্কুল ছুটি হত তাহলেও দেখতাম স্কুল গেটের গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতো। আবার অপর দিকে কোন কারণে শেষের পিরিয়ড অফ্ থাকলে মৌসুমীর জন্য ওরা দুজন অপেক্ষা করতো।

আমাদের স্কুলটি মৌসুমীর গ্রাম সংলগ্ন। স্কুল যাতায়াতের পথেই। স্কুল আসার পথে মৌসুমীকে সঙ্গে নিয়ে আসতো এবং বাড়ী ফেরার পথে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যেত।

এটা ছিল ওদের স্কুলের যাতায়াতের রুটিন, কোনদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এনিয়ে রতন ও কনকের সাথে খুনসুটি করতে ছাড়তাম না।

এ ব্যাপারে সঞ্জয়ই বেশি ক্ষাপাতো :— কিরে, রতন, কনক, তোরা দুজনে কি ঐ মেয়েটির কেয়ারটেকার, না বর্ডি গার্ড, নাকি লোকাল গার্জেন; সব সময় আগলে আগলে রাখিস?

দেবাশীষ: না রে— ডাঁসানো পেয়ারা তো; তাই কেউ যাতে ঠোকরাতে না পারে তার জন্যই ওরা সর্ব্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছে দেখছিস না। রতন ও কনক খানিকটা ঝাঁঝ মেরেই বললে— ওকে নিয়ে একদম আজে বাজে কথা বলবি না। তোরা কোন কিছু না জেনে ফালতু ফালতু বকছিস। আর ও ডাঁসা পেয়ারা নয়, পাকা বেল।

আমি : তা তোদের সাথে একটু ইয়ার্কি-রসিকতা করলে এত রেগে যাচ্ছিস কেন? ব্যাপার তো কিছু একটা আছে, না কি? তা আমাদের কাছে খুলে বলতে আর দোষটা কি? আমরা এই তিনজন ছাড়া আর কার কাছেই বা বলে মনের দুঃখ হাল্কা করবি?

কনক : তুই হাসালি। আমাদের কারো মনে কোন দুঃখ নেই, বরং আছে অনাবিল আনন্দ—বুঝলি। বরং তোদের মনের অবস্থাটাই খারাপ। দিনের পর দিন এসব রসালো, ছাঁকা লাগা মন্তব্য শুনতে শুনতে কনক রতনের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। আর আমরাও ওদের গায়ে হুল ফোটাতে ব্যর্থ হতে হতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ততদিনে আমাদের সাথে মৌসুমীর টুকটাক কথাবার্ত্তা আলাপ চারিতাও শুরু হয়েছে। অবশ্য রতন ও কনকের ছাড়পত্র বিনা সম্ভব ছিল না।

৫:সিগারেটে প্রথম ফুঁক

আষাঢ় মাসে রথের মেলা বসেছে মৌসুমীদের গাঁয়ে। প্রতি বৎসরই বসে, আত্মীয় স্বজন আসে, বন্ধু বান্ধবেরাও জড়ো হয়ে মেলাতলার হাতেগরম জিলাপী, পাঁপড়, চপ বেগুনী খেতে আসে; আর মনোহারী দ্রব্য, সাংসারিক সামগ্রীর বিক্রি বাটাও মন্দ হয় না।

সেবার আগের দুদিন পরপর ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় মেলার মাঠে ইতস্ততঃ কোথাও কোথাও ছিঁটে ফোটা জল দাঁড়িয়ে গেছে। বিঘে খানেক মেলাচত্বরে দর্শনার্থীদের পায়ে পায়ে তখন আলাপী কাদা মাখো মাখো ।

না-এবার মেলা ভালো জমে উঠিনি। কেবল জিলাপী, পাঁপড়, চপের দোকানগুলিতে উৎসাহী ছেলে মেয়েদের ভিড়। গৃহবধূরা নৈবেদ্য সাজিয়ে রথের চাকায় জল ঢেলে প্রণাম সেরে বাড়ী ফিরছে।

রথের ছুটি, তারপর মেঘলা মেঘলা আবহাওয়ায় দিবা নিদ্রা সেরে উঠতে বেলা গড়িয়ে বিকেল। প্রতিদিনের মত আজ আর খেলার মাটে যেতে ইচ্ছে করছিল না

সঞ্জয় বললে, চল আজ একটু রথের মেলা ঘুরে আসি। আমার যাবার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সঞ্জয় আর দেবাশীষের চাপে পড়ে অগত্যা যেতে হল।

শর্ত হল– মেলাতলায় সঞ্জয় খাওয়াবে জিলাপী আর পাঁপড় খাওয়াবে দেবাশীষ।

মেলাতলায় আমরা তিনজনে এসে হাজির। ইতস্তত ভাবে তিন জনে মিলে মেলা পরিক্রমা করছি। কয়েকজন পরিচিত মুখের সাথে দেখা সাক্ষাত হল। আমি বললাম : সঞ্জয় এবার জিলাপীর অর্ডারটা দিয়ে আয়, আমরা এখানেই দাঁড়াচ্ছি। সঞ্জয়ের শকুনের নজর—আরে এই দেখ্, রতন-কনক গাছে ঠেস দিয়ে কেমন জিলাপী চিবোচ্ছে! দেবাশীষ কে ও আমাকে দেখিয়ে বললে–

ওই দ্যাখ—শুধু কনক আর রতন নয়রে, সঙ্গে গাছের ও পাশে মৌসুমীও আছে মনে হচ্ছে।

সঞ্জয় বললে– চল ওদিকে একটু প্যাঁক দিয়ে আসি।

আমরা গুটি গুটি তিনজনে ওদের সামনে হাজির হতেই– রতন বললে ওঃ তোরা এসে গেছিস—নে জিলাপী খা। দেখলাম ঠোঙায় মাত্র দুখানা ভাঙ্গা জিলাপী পড়ে আছে। সঞ্জয় বললে– শালা এতক্ষণ ধরে তিন জনে জিলাপী খেয়ে শেষে দুখানা ভাঙ্গা জিলাপী?

কনক বললে,– দেখ্ জিলাপী আমাদিকে মৌসুমী খাইয়েছে আর ওই আমাদিকে নেমতন্ন করেছিল তাই। আমি বললাম– মৌসুমী তুই রতন-কনক কে নিমন্ত্রণ করলি, আর আমরা যে ঘর-বাড়ী ছেড়ে হোস্টেলে পড়ে আছি–আমাদিকে নিমন্ত্রণ করলি না।

মৌসুমী– আমতা আমতা করে বললে- হ্যাঁ সত্যিই তোমাদিকে বলা উচিত ছিল; ভুল হয়ে গেছে।

সঞ্জয় বললে শুধু ভুল স্বীকার করলে তো চলবে না, ভুলের মাশুল দিতে হবে। যা আরও পাঁচশো গ্রাম জিলাপী কিনে নিয়ে আয়। মৌসুমী যেতে উদ্যোগী হতেই কনক বললে– দাঁড়া-আমি এনে দিচ্ছি দে টাকা দে।

আমি দেবাশীষকে বললাম পাঁপড় ভাজাটা তুই নিয়ে আয়।

দেবাশীষ : আগে জিলাপী খাই তার পর পাঁপড় আনবো।

একটু বাদেই কনক শালপাতার ঠোঙায় জিলাপী নিয়ে এসে মৌসুমীর হাতে দিলে। মৌসুমী পুরো টোঙাটাই সঞ্জয়ের হাতে দিয়ে বললে, ভুলের মাশুল এবার শোধ হল তো। সবাই মিলে হেসে উঠলাম। সঞ্জয় বললে নে- এবার সবাই মিলে খেয়ে উদ্ধার কর।

মৌসুমী বললে– না- আমরা তো খেয়েছি– তোমরা খাও।

আমি বললাম– এ্যাই মৌসুমী এখানে আর আমরা তোমরা করিস না। নে ঠোঙাটা ধর, আর তুই ঠোঙা থেকে জিলাপী হাতে হাতে দিয়ে দে।

মৌসুমী : হাতে হাতে ধরে গরম জিলাপী খেতে পারবে না, তার চেয়ে আমি ঠোঙাটা ধরে থাকি—তোমরা বরং এই ঠোঙা থেকেই খাও। মৌসুমীর প্রস্তাব মত এক ঠোঙাতেই জিলাপী ভোজন– পাঁপড় ভোজন সারা হলো।

বেলা তখন প্রায় শেষ। সূর্য্যদেব পশ্চিমে ঢলে পড়েছে 'ডুব' দেবে কিনা ভাবছে। রতন বললে মৌ' তুই বাড়ী চলে যা। আমরা বরং গল্প করতে করতে বাড়ী চলে যাবো। রতনের মুখে মৌসুমীর শট-নেম 'মৌ' শুনে আমরা এর-ওর দিকে চাওয়া-চাওয়ি করছি। অবশ্য কনকের কোন ভাবান্তর নেই।

পথে যেতে যেতে– দেবাশীষ বললে, চল ঐ পুকুর পাড়ে গিয়ে একটু হিসি করে আসি। রাস্তা সংলগ্ন মজে যাওয়া পুকুর পাড়ে একটা গাছতলায় এসে সবাই বসলুম। দেবাশীষ একটু দূরে ঝোপের আড়ালে হিসি করে ফিরে এল। আমরা এক ক্লাসে পড়লেও দেবাশীষ আমাদের থেকে দু-এক বছরের বয়সের বড়ই হবে। কারণ আমাদের যখন গোঁফের রেখা উঁকি মারছে ওর তখন সেলুনে দাড়ি-গোঁফ কাটা শুরু হয়ে গেছে। সেই সূত্রে বলা যায় দেবাশীষ আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। শুধু তাই নয়, ওর কথা আমরা ফেলতে পারতুম না। কখনো কখনো ইচ্ছে না থাকলেও ওর ইচ্ছে অনুযায়ী আমরা চলতে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। কারও কোন শরীর খারাপ করলে বা আর্থিক অসুবিধা থাকলে ওই সব কিছুর প্রথম ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিত। ফলে ক্রমশঃ বন্ধুত্বের সম্পর্ক যেমন নিবিড় থেকে নিবিড়তম হয়েছে তেমনি ওর উপর আমাদের আস্থাও বেড়েছে।

গাছ তলায় আমরা পাঁচজনে গোল হয়ে মুখো-মুখি বসে আছি, দেবাশীষ প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বের করলো।

দেবাশীষের দৌলতে আমিও সঞ্জয় তখন সিগারেটে ফুঁ মারতে শিখেছি।

রতন বললে– কিরে তোরা সিগারেট খাস নাকি? কনকেরও একই প্রশ্ন। একথা শুনে দেবাশীষ এবার সিগারেট খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান দিতে শুরু করলো। শোন– বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলসী গাছে জল দিয়ে ধূপ দিতে দেখেছিস? কেন দেয় বল দেখি– আসলে ঐ ধূপের ধোঁয়ায় যেমন মশা মাছি দূরে থাকে তেমনি ধূপের সুবাসে মনও প্রফুল্ল থাকে। ঠিক্ তেমনি সিগারেটে দু-একটান দিয়ে বুদ্ধির ঘরে ধোঁয়া দিলে– আমাদের মাথার মধ্যে যে বুদ্ধির কোষগুলো সুপ্ত অবস্থায় থাকে–তা জেগে ওঠে এবং বুদ্ধি খোলে, বুঝলি?

বুদ্ধি খোলার আজব ধোঁয়াতত্ত্বের সামনে রতন-কনক হোঁচট খেতে আরম্ভ করলো। কনক-বিস্ময়ের সুরে বললে– তুই এসব তত্ত্ব কোথা পেলি বল দেখি?

দেবাশীষ :– আর দেখিস নি– সাধু-সন্যাসীরা কেমন গাঁজার কল্কেতে টান মেরে সাধনাপিঠে গুম মেরে বসে থাকে–আসলে ধ্যান যোগে সিদ্ধিলাভ করতেই তো মনকে বাঁধতে গাঁজার কল্কেতে টান মারে।

এমন মক্ষম যুক্তির কাছে রতন, কনক পরাস্ত। হ্যাঁ তাও বটে।

দেবাশীষ সিগারেটের প্যাকেট খুলে দেখে মাত্র তিনটে সিগারেট আছে। বললে তিনটে আছে– পাঁচজনে হবে কি করে– রতন বললে– তোরা তিনজনে খা– আমরা খাবো না।

দেবাশীষ : সে কিরে– এক যাত্রায় কখনো পৃথক ফল হয়, নে-নে-ধর– ধর খেয়েই দেখ না, ভাল না লাগলে আমরা তো আছি।

অনিচ্ছা সত্বেও একটা সিগারেট রতনের দিকে বাড়াতেই বললে– একটাতেই হবে কনকের সাথে খাবো। অগস্তক দেবাশীষ সঞ্জয় আমি– তিন জনে দুটো সিগারেট ধরিয়ে ঠোঁট পাল্টা পাল্টি করে খাচ্ছি। রতন সিগারেটে দু-চার টান মারতেই– খুক খুক করে কাশতে আরম্ভ করলো এবং কনকের দিকে বাড়িয়ে বললে নে-খা। খেয়ে দেখ কেমন লাগে। কনক দু-একটান দিয়ে সেও বিষম খেতে লাগলো— বললে আর খেতে পারবো না– কি-বিশ্রী স্বাদ–এই বলে সিগারেট ছুঁড়ে দিল। সাত তাড়াতাড়ি সেই আধ খাওয়া সিগারেট কুড়িয়ে সঞ্জয় টান মারতে আরম্ভ করলে।

দেবাশীষ রতন-কনক কে উদ্দেশ্য করে বললে— আসলে তোরা বোধ হয় ধোঁয়াটা গিলে ফেলেছিস তাই তোদের ওরকম অবস্থা। আসলে সিগারেট খাওয়ারও একটা পদ্ধতি আছে। এই বলে দেবাশীষ–সিগারেট খাওয়ার প্রাথমিক ট্রেনিং দিতে শুরু করলো। আমাদের তখন– সিগারেট পুড়ে ছাই। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, এবার হোস্টেলে ফেরার পালা। রতন জিজ্ঞেস করলো– মুখে যে সিগারেটের গন্ধ লেগে আছে, বাড়ী ফিরবো কি-করে?

দেবাশীষ– কোথাও তুলসী পাতা পেলে চিবিয়ে কুলকুচি করে নিবি, না হলে নিম দাতন করে মুখ ধুয়ে বাড়ী ঢুকবি।

রতন কনকেরা তুলসীপাতা বা নিম দাঁতন করে বাড়ী ফিরেছিল কিনা জানি না। তবে আমরা তিনজনে ফেরার পথে পেয়ারা পাতা চিবোতে চিবোতে হোস্টেলে ফিরেছিলাম।

৬ : সম্পর্ক সূত্র

একদাশ শ্রেণীতে তখন আমাদের টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। সামনেই ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি। এ বছর আর পুজোর ছুটিতে বাড়ী যাওয়া হবে না। কারণ প্রাইভেট টিউটরের সাজেসন এবং স্কুলে স্যারেদের স্পেশাল কোচিং।

আশ্বিনের গোড়ার দিকে প্রবল নিম্নচাপের ফলে গ্রামের চাষীদের মাথায় হাত– ধানরোয়া, নিড়ানের কাজ শেষ, সার চাপান দেওয়ায় ধানের গোছা বেড়েছে; কিন্তু তিন দিন ধরে প্রচণ্ড বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ায় পাকা রাস্তা ছাড়া গোটা মাঠ সাদা ধু-ধু – সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। সব থেকে বিপর্যয়কর অবস্থা গ্রামের গরীব পাড়াগুলোর। খড়ের চালের কঞ্চির ছিঁটেবেড়া দেওয়া অধিকাংশ মাটির বাড়ী ভেঙে পড়েছে। সরকারী ত্রাণ খুবই অপ্রতুল এবং তাও আবার সময় মত পাওয়া যায় না। একে তো হাতে কাজ নেই, তার উপর মাথা গোঁজার ঠাঁই, সেটাও অনেকের নেই। আমাদের হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট তরুন বাবু আমাদের তিনজনের নেতৃত্বে আরও চার পাঁচ জন ছেলেকে নিয়ে একটা সেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করলেন। অর্থ, বস্ত্র, চাল সংগ্রহ অভিযানের জন্য। প্রয়োজনীয় দুটি চটের খালি বস্তা। অর্থ সংগ্রহের জন্য খালি দুধের কৌটো; চারদিকে আঠার প্রলেপ দিয়ে কাগজ চিটিয়ে সিল করা, মাঝখানে ফুটো করা ভাঁড় সঙ্গে আর একটা বিছানার চাদর। নির্দেশ মতো আমাদের স্কুল সংলগ্ন গ্রামে অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই আমরা বাজারে কালেকশন শুরু করলাম। বাজারের সব দোকানের মালিকরাই আমাদেরকে চেনে। দুঃস্থ মানুষের সাহায্যার্থে আমাদের দেখে আশাতীত ভাবে অর্থ সাহায্য করেছেন। মুদীর দোকানের মালিকরা চাল, ডাল, নুন তেল দিয়েছেন, আনাজের

দোকানদাররা আলু, পিয়াঁজ দিয়েছেন। বাজার ছাড়িয়ে এবার আমরা গ্রামের দিকে রওনা দিলাম। গ্রামের সম্পন্ন পরিবারের সংখ্যা খুবই কম। তবুও এই বিপর্যয়কর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই সাধ্যাতীত সাহায্য করেছিলেন, চাল, আটাতো বটেই, পুরানো জামা কাপড়ের পুঁটলীও আয়তনে বেশ বড় হয়েছে। হোস্টেল সুপার আমাদের তিনজনকে বলেছিলেন, সংগৃহীত সামগ্রী যেন ও গ্রামেই সনৎ বাবুর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

সেইমত– চাল ডাল সবজী জামাকাপড়ের পুঁটলী মাথায় করে বয়ে নিয়ে সনৎবাবুর বাড়ীর দিকে রওনা দিলুম। গ্রামের দুই এক জনকে জিজ্ঞাসা করে সনৎবাবুর বাড়ীর দরজায় হাজির হোয়ে একটা লোককে বললাম– সনৎবাবুকে একটু ডেকে দেবেন? সম্ভবত লোকটি ঐ বাড়ীরই কাজের লোক হবে। উনি বাড়ীর ভিতর গিয়ে সনৎদা তোমাকে তিনজন ছেলে ডাকছে কেন দেখ।

সনৎবাবু: ওদেরকে ভিতরে আসতে বল। লোকটি আমাদেরকে ভিতরে যাওয়া জন্য বললে; আমরাও মাথায় মোট সমেত ভিতরে গেলাম।

আমরা : তরুন স্যার– আপনার বাড়ীতে এই মালগুলো পৌঁছে দিতে বলেছেন।

আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা ঐখানটায় মালগুলি রেখে দাও; পরে গুছিয়ে রাখবো।

সনৎবাবু তিন কুঠুরি টিনের চালের মাটির বাড়ী; দাওয়াটি বেশ উঁচু।

দেখছি দাওয়ার একধারে বসে রতন আর কনক একথালায় মুড়ি চিবোচ্ছে। আমরা তো বিস্ময়ে হাঁ– রতন- কনক এখানে কি ভাবে?

দেবাশীষই জিজ্ঞেস করলো– কি রে- এখানে তোরা।

রতন : আমাদের আর কনকের গাঁ থেকে কালেকসন করে এখানে জমা দিতে এসেছি।

সঞ্জয় : আর এসে এই দুর্দিনে পেটপুরে মুড়ি সাঁটাচ্ছে।

বিস্ময়ের তখনও একটু বাকী ছিল। ঘরের ভিতর থেকে সনৎবাবু স্ত্রী বললেন– তোমরাও কলে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এসো বাবা, দুটি মুড়ি খেয়ে যাবে। এতখানি বেলা হলো– মুখতো একেবারে শুকিয়ে গেছে।

আমরা কলে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে দাওয়ায় উঠতে যাবো, এমন সময় দেখি– রতন, কনককে গ্লাসে জল ঢেলে দিচ্ছে মৌসুমী।

আমাদের তো ভিমরি খাওয়ার অবস্থা, কথা বলতে ভুলে গেছি। শেষে, মৌসুমী বললে– এটাই আমাদের বাড়ী, সনৎ ভট্টাচর্য্য আমার বাবা।

ওদিকের ঘরে সনৎবাবুর সঙ্গে আরও দু-জন ভদ্রলোক মেঝেয় শতরঞ্চি পেতে কি সব নিয়ে আলোচনা করছেন।

রতন, কনকের খাওয়া শেষ হলে মৌসুমী ওদের হাত ধোয়ার জন্য জল ঢেলে দিচ্ছে। এপাশে মৌসুমীর মা আমাদের জন্য আসন পেতে গামলা মুড়ি, চানাচুর, পেয়াঁজ, কাঁচালঙ্কা নিয়ে এসেছেন। মৌসুমীকে ডেকে বললেন, ওরে তিনটে থালা নিয়ে এসে মুড়ি বেড়েদে।

সঞ্জয়– আর থালা আনতে হবে না। চানাচুর, পিয়াঁজ, কাঁচালঙ্কা কুচিয়ে একটু সরষের তেল দিয়ে– ঝালমুড়ি বানিয়ে দে।

আর একটা খবরের কাগজ এনেদে– ওতেই আমরা খেয়ে নেব। এদিকে রতন, কনক খাওয়া শেষ করে বাড়ী ফেরার উদ্যোগ নিতেই- এঘরের ভেতর থেকে একজন বললেন– কনক তোর মাকে বলিস, সনতের বাড়ীতেই দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেব। যেন আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে না থাকে।

অন্য একজন বললেন– রতন তুইও বাড়ীতে বলে দিবি, সনৎএর বাড়ীতে আমিও খাবো। আর হ্যাঁ গরুগুলোকে ডাবায় বেঁধে দিবি। জাবনা সাজা আছে।

এবারে বোঝা গেল– প্রথম ভদ্রলোক কনকের বাবা আর দ্বিতীয় জন রতনের বাবা। কিন্তু এই তিনজন 'বাবারা' একসঙ্গে? এই কৌতূহল তখনকার মত থেকেই গেল।

আমরা যথারীতি মৌসুমীর হাতে পাঞ্চ করা ঝালমুড়ি প্রায় শেষ করে ফেলেছি, দেখি তরুন স্যার সনৎবাবুর বাড়ীতে এসে হাজির

কিরে তোরা এসে গেছিস!

নে- মুড়ি খেয়ে হস্টেলে ফিরে যা। আমার ফিরতে একটু দেরি হবে। হোস্টেলে খাওয়ার সময়টা তোরা একটু লক্ষ্য রাখিস যেন অন্য ছেলেরা আবার বদমায়েশী না করে।

বোঝা গেল তরুণ স্যারের এই বাড়ীটি অপরিচিত নয়। আমাদের মুড়ি খাওয়া হলে– হস্টেলে ফেরার পালা। মৌসুমী বললে এ বেলাটা আমাদের বাড়ীতে দুটি খেয়ে যেতেও পারতে।

আমি : নারে- দেখলি না; স্যার আমাদিকে হোস্টেল ম্যানেজ করার দায়িত্ব দিলে। ঠিক আছে নেমতন্ন তোলা রইলো, অন্য কোন একদিন খেয়ে যাবো।

সেখ আব্দুল মান্নান

মনের আকাশে আলো

অফিসে পৌঁছে ব্যাগ থেকে কাগজটা বের করে ইরফান প্রথম পাতার প্রথম খবরে চোখ রেখেই অবাক। গতকালই রাজ্যসভায় ধ্বনিভোটে সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা অ্যাক্টে পরিণত হওয়াকে কেন্দ্র করে দেশময় প্রতিবাদের ঝড়। বিদ্রোহের আগুনে দাউদাউ জ্বলছ চারদিকে। ঘরবারি,সরকারি,বেসরকারি যানবাহনে আগুন ধরিয়ে পথে নেমেছে বিদ্রোহী জনতা। প্রতিটি সংবাদের শিরোনামে ফুটে উঠেছে অ্যাক্টটির অশনি সঙ্কেত। গোটা পাতা জুরে বিক্ষুব্ধ জনতার রোষানলে পুড়ে ছারখার হওয়া সরকারি সম্পত্তির বীভৎস ছবি। অ্যাক্টটির মুখ্য উদ্দেশ্য নাকি ভিন রাষ্ট্র থেকে আসা অমুসলিমদের নাগরিকত্ব প্রদান আর অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের বেছে বেছে দেশ থেকে বহিষ্কার করা ! তাই যদি হয় তাহলে ওদের কি হবে ? ওর আব্বারাও তো ওদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ভিটেমাটি ছেড়ে চলে এসেছিল এদেশে মা আর দাদিকে সঙ্গে নিয়ে। তখন ওর জন্ম হয়নি। সেদিন থেকে ওরা এখানে বসবাস করছে শান্তিতে। এত বছর পরে এই মসিবত ! রাতের ঘুম উড়ে গেছে ওর আব্বার। ঝানু রাজনীতিবিদদের মতে সিএএ আর এনআরসি নাকি কয়েনের এপিঠ ওপিঠ। তাহলে এখন এর মোকাবেলা হবে কিভাবে... !

এম্নিতে রোজ কাঁটায় কাঁটায় দশটায় অফিসে পৌঁছেই চোখেমুখে জল দিয়ে, পিওনের দিয়ে যাওয়া চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কাগজের সব পাতায় একবার হাল্কা চোখ বুলিয়েই টেবিলের কাজে মন দেওয়া ইরফানের অভ্যেস। চটকদার কোন খবর পেলেই সেটা নিয়ে অন্য কলিগদের সাথে একটু শেয়ার করে মস্করাও করে কখনো সখনো। কিন্তু আজ কাগজের প্রথম পাতার খবর আর ভয়ঙ্কর ছবিগুলো ভাবিয়ে তুলেছে ইরফানকে। কাগজে অপলক দৃষ্টি মেলে বিষণ্ণ মনে ভাবছে কথাগুলো। হঠাৎ কেঁপে উঠলো স্মার্ট ফোনের স্ক্রিন। কাগজ থেকে ঘার ঘুরিয়ে স্ক্রিনে তাকাতেই দেখতে পায় আলোর উচ্ছল মুখ। ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সে কল করছে। সহসা বিষন্নতা উবে ইরফান একেবারেই স্বাভাবিক। যেন জিওন কাঠির ছোঁয়ায় অন্য ইরফান। উধাও সিএএ এনআরসির কালো মেঘ।

আলোর ফোনে ঝলক খুশি আছড়ে পড়ার আগেই ইরফান সিরিয়াসলি ভাবতে লাগল। আলো এখন কেন ফোন করছে ? অফিস আওয়ারসে তো ফোন করার কথা নয় ? যা কিছু কথা তো রাতেই বলে। তবে কি বিশেষ কোন প্রয়োজনে ? আজ কি এমন দরকার পড়ল যে অফিস আওয়ারসে... ? ডান তর্জনীতে স্যুইপ করে কলটা রিসিভ করার সাথে সাথেই ক্যামেরার

ফ্লাসের মত ঝলসে উঠলো আলোর সাথে পরিচয়ের মিষ্টি মুহূর্তগুলি।

সেবার বারাসাতে পুজোর মেলাতেই আলোলিকার সাথে ইরফানের হঠাৎ পরিচয়। ঢাকা থেকে বেড়াতে এসেছিলো মাসির বাড়িতে। অবশ্য ইরফানের কলেজমেট ওরফে আলোলিকার মাসির মেয়ে কমলিকাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ওর সাথে। ইংলিশে অনার্স নিয়ে বিএ ফার্স ইয়ারের ছাত্রী আলোলিকা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রং। পরনে কাঁচা হলুদ রঙের সালোয়ার কামিজ। প্লাক করা ভুরু। ম্যাচিং কানের দুল। দুহাতের আঙুলে মিষ্টি নেলপালিশ। ঝিকমিক বিন্দু টিপ উজ্জ্বল কপালে। কথা বলার সময় একগুচ্ছ শ্যাম্পুকরা চুল মুখের ওপর উড়েউড়ে এলে আরও মিষ্টি লাগছিল আলোলিকাকে।

পুজোর কদিনেই আলোলিকার সাথে ইরফানের গড়ে উঠেছিলো বন্ধুত্ব। প্রতিদিন মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে ঠাকুর দেখেছিল, খেয়েছিল নানা রকমের খাবার। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলো দুদেশের নানান গল্প। কথায় কথায় ইরফান বলেছিল ওর আব্বা-মা দাদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে পাকিস্থানি সেনাদের অত্যাচার থেকে বাঁচতেই নাকি রাজশাহীর বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে চলে এসেছিলো ভারতে। আলোলিকা বলেছিল ওই সময়ে ওরা ঢাকাতে থেকে গেলেও ওর দিদিমা-দাদু বড় মামা আর ছোট মাসিকে নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে চলে এসেছিলো এখানে। পরবর্তীতে আলোচনা প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের কথা উঠলেই দিদিমার দুচোখ ভরে যেতো জলে। মামারা এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। মাসি মেসো দুজনেই সরকারি চাকরি করেন। একমুখ হেসে আলোলিকা বলেছিল জানেন তো আমরা বাঙাল হলেও আমার মেসো কিন্তু পাক্কা ঘটি।

হঠাৎ আলোলিকার মুখে বাঙাল-ঘটির কথাটায় খটকা লেগেছিল ইরফানের। কেন ওই প্রসঙ্গ তুললে আলোলিকা ! বিষয়টা নিয়ে এক মুহূর্ত চুপচাপ ভাবছিল ইরফান। এমন সময় আলোলিকাই বলেছিল - কী হোল অমন গুম হয়ে গেলেন যে, বাঙাল ঘটির ব্যাপারটা জানেন না ?

ইরফান তখন আমতা আমতা করে বলেছিল- না না তা নয়, আসলে আব্বার মুখে আমার দাদুর এদেশে আসার গল্প শুনেছিলুম বটে। তবে আমার জন্ম পড়াশুনা সবই এদেশে, তাই বাঙাল ঘটির আলাদা কোন অস্তিত্ব আছে বলে আমার কখনোই মনে হয়না।

ইরফানের ওই কথায় আলোলিকা হাঁসতে হাঁসতে প্রায় গড়িয়ে পড়ে বলেছিল - কেন মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখেননি ? ওটাকেতো এখানকার সবাই বাঙাল ঘটির খেলা বলেই জানে। কোনো কোনো খেলায় তো দুদলের সমর্থকদের

- হ্যাঁ ওটা আপনি ঠিকই বলেছেন। এখানে যেদিন ইস্ট বেঙ্গল মোহন বাগানের খেলা হয় সেদিন গ্যালারিতেই দু-দলের সমর্থকদের মধ্যে কিছু না কিছু ঝুট-ঝামেলা লেগেই যায়। যার রেশ পরের দিন পাড়ার চায়ের দোকানে পর্যন্ত গড়ায়। তবে আপনি যাই মনে করুন না কেন এই বাঙ্গাল-ঘটির ঝগড়াটা আমার একদমই পচ্ছন্দ নয়।

মধ্যে ধুন্দুমার কাণ্ডও ঘটে শুনেছি। আর আপনি... ! যাকগে এসব কথা। শুধু শুধু এসব আলোচনা করে আর আপনাকে বিব্রত করতে চাইনা। তবে অন্য একটা কথা আপনাকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে যদি অনুমতি দেন।

না না অনুমতির কি আছে, আপনার যা মন চায় বলুন। এক ঝলক হেঁসে অকপটে বলেছিল ইরফান।

আপনি না ভীষণ সুন্দর মনের মানুষ। তাই যেকোন কঠিন কথার জবাব খুব সাবলিল ভাবেই দিতে পারেন আপনি। আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য কমলিকাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সিমপ্লিসিটি যে একজন মানুষের স্মার্টনেস হতে পারে তা আপনার সাথে পরিচয় না হোলে বুঝতে পারতুম না। ইরফানের চোখে চোখ রেখে নিঃসঙ্কোচে কথাগুলো বলেছিল আলোলিকা।

আলোলিকার মুখে একগুচ্ছ প্রশংসা শুনে অস্বস্তিতে পড়েছিল ইরফান। শেষে প্রসঙ্গ বদলে ফিরে এসেছিল আলোলিকার আগের কথায়। লাজুক হেসে বলেছিল - হ্যাঁ

ওটা আপনি ঠিকই বলেছেন। এখানে যেদিন ইস্ট বেঙ্গল মোহন বাগানের খেলা হয় সেদিন গ্যালারিতেই দুদলের সমর্থকদের মধ্যে কিছু না কিছু অজুহাতে ঝুট-ঝামেলা লেগেই যায়। যার রেশ পরেরদিন পাড়ার চায়ের দোকানে পর্যন্ত গড়ায়। তবে আপনি যাই মনে করুন না কেন এই বাঙ্গাল-ঘটির ঝগড়াটা আমার একদমই পচ্ছন্দ নয়। যদিও আমার পাঁচ ওয়াক্তের নামাজী আব্বাও আপনাদের মানে ইষ্টবেঙ্গলের ব্লাইন্ড সাপোর্টার। তথাপি কোনোদিন আব্বার মধ্যে বাঙাল-ঘটির কোন ভেদাভেদ দেখিনি।

আলোলিকা আবার হাসতে হাসতে বলেছিল- যাকবাবা আপানারা যে এসবের ধার ধারেন না সেটাই মঙ্গল। চলুন এবার বাড়ি ফেরা যাক। এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে, মাসি টেনশন করবে। কাল আবার দেখা হবে আশাকরি। তবে একটা শর্ত, কাল কিন্তু আমি রেডি হয়ে থাকব। আপনি এলেই বেরিয়ে পড়বো। কমলিকা আগেই বলে রেখেছে কাল ওর কোন বন্ধুর বাসায় নেমন্তন্ন আছে।

তিন বছরেই ওদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক পেরিয়ে ওরা প্রেমিক-প্রেমিকা। আলোলিকা ইরফানের আদরের আলো। আলো নামেই সম্বোধন করতে ভালো লাগে ইরফানের। ইরফানের মুখে আলো সম্বোধনটা এক বিশেষ ধরণের তৃপ্তি দেয় আলোলিকাকে। একটা মিষ্টি সম্পর্কের স্বাদ পায় ওই সম্বোধনে। ইরফানও অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করে আলোর মুখে তুমি সম্বোধনে।

গত পুজোতেও আলোলিকা বারাসাতে এসেছিল মাসির বাড়িতে। পুজোর কটাদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যে ইরফানের সাথে ঘোরাঘুরি করেছিল আরামসে। একদিন মেলায় ঘোরাঘুরি করে নিরালায় বসে গল্প করতে করতে আলোলিকা হঠাৎ ইরফানকে বলেছিল দেখ আমি যদি কখনো বিয়ে করি তাহলে কিন্তু তোমাকেই করব। আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে মেসো মাসি দুজনেরই কোনো আপত্তি নাই। এমনকি ঢাকায় আমার বাবা মাকেও ওরা সব কথা বলে দিয়েছেন।

আলোলিকার মুখে বিয়ের প্রস্তাব শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়েছিল ইরফান। বেশ কিছুক্ষণ আলোলিকার মুখের পানে অবাক চোখে চেয়ে থেকে এক সময় নিঃশব্দে আলোলিকার কপালে একটা উষ্ণ চুম্বন দিয়ে ইরফান বুঝিয়ে দিয়েছিল তার সদিচ্ছা। সেদিন অনেক কথার ফাঁকে আলোলিকা ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল যে বিয়ের পর সে ইংলিশে এমএটা কমপ্লিট করবে ভারতে এসে। মাইগ্রেসন করে এখান থেকে এমএ পাস করলে ভবিষ্যতে চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে সুবিধে হবে।

আলোলিকার কথায় মনে মনে উল্লসিত হলেও একটা প্রশ্ন ভাবিয়ে তুলেছিল ইরফানকে। আলোর মেসো-মাসি, বাবা-মা ওদের সম্পর্কটা মেনে নিলেও ওর আব্বা-মা কি মেনে নেবে সহজে ? নেবে না। তবুও আব্বা-মাকে বুঝিয়ে ওদের সম্পর্কটাকে মানিয়ে নেওয়াতেই হবে। এটা একটা ওর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

সম্প্রতি ওদের বিয়েকে ঘিরে দু-তরফে একটা সমস্যা দানা বেঁধে উঠেছে। নাগরিক্তের সমস্যা। আলোলিকা ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহন না করা পর্যন্ত ইরফানের সাথে বিয়ে কোন মতেই সম্ভব নয় ! কিন্তু চাইলেই তো নাগরিকত্ব গ্রহন করা যায়না। তার জন্যে অনেক হ্যাপা পোয়াতে হবে। তাছাড়া সরকারই বা কেন চাইবে একজন বাংলাদেশিকে নাগরিক্ত দিতে ? আসছে পুজোতেও মাসির বাড়ি বেড়াতে আসবে বলে ফোনে জানিয়েছে আলোলিকা।

আব্বা-মা'র একমাত্র সন্তান ইরফান। তাই অনিচ্ছা স্বত্বেও ছেলের অসবর্ণ বিয়ের প্রস্তাবটা মেনে নিয়েছেন ওর আব্বা-মা। তবুও চিন্তা, এক দেশ থেকে আর এক দেশে বিয়ের ঝামেলা মেটাবে কেমন করে! বিয়ের জন্যে হয় ঢাকায় যেতে হবে ইরফান তার পরিবারকে, নাতো আলোলিকাকে নিয়ে ভারতে আসতে হবে ওর পরিজনদের। আর ওই যাতায়াতের একমাত্র ভরসা তো পাসপোর্ট। এতগুলো পাসপোর্ট একসাথে যোগার করাও মুখের কথা নয় !

পরিচয়ের পর বছরে একবার পুজোর সময় সরাসরি দেখাদেখির পাশাপাশি আলো ইরফানের ভৌগলিক দূরত্ব মুছে দিয়েছে স্মার্ট ফোন। তাই মন চাইলেই টাচ স্ক্রিনে অপলকে চেয়ে ভাবের বিনিময় করেছে একে অপরে। কখনো বা ফ্লাইং কিসে ভিজিয়ে দিয়েছে টাচ-স্ক্রিন।

খ

মোবাইল স্ক্রিনে থঅ হয়ে চেয়ে থেকে আলোলিকার মধুর স্মৃতি রোমন্থন করে কিছুটা সময় পেরিয়ে গেলে সম্বিৎ ফেরে আলোলিকার কথায়। কী হোল কখন থেকে তোমার দিকে

চেয়ে রয়েছি আর তুমি কিছু না বলে আকাশ পাতাল ভাবছ ? আরে এতো দারুন খবর। কাল তোমাদের ওখানে সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা আইনে পরিণত হয়েছে না ? ব্যাশএবারতো আর আমাদের বিয়ের কোন সমস্যাই রইলনা। জানো, একেই বলে ওপরঅলা বলে একজন আছেন। তিনি চাইলে কিনা হতে পারে।

আলো এক টানা কথা বললেও ইরফানের মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না। কেমন যেন হতভম্বের মতো শুধু তাকিয়ে থাকল আলোর মুখের দিকে। চকিতেই ওর হাসিখুশি চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠলো।

ইরফানের কোন জবাব না পেয়ে আলোর মনে হোল - তবে কি ইরফান খুশিতে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে ? কথা বলছেনা কেন ? কথাগুলো স্বগতোক্তি করেই আলো এবার উৎফুল্ল হয়ে বললে - আচ্ছা, তুমি কি খুশিতে একেবারে পাগল হয়ে গেলে নাকি, কথা বোলছনা যে ! নাকি ভাবছ একদেশ থেকে আর একদেশে কিভাবে আমাদের বিয়েটা সম্পন্ন হবে ? আরে বাবা, অত ভাববার কি আছে। প্ল্যান করে এগোলেই তো হোল। তুমি তোমার বাবা-মাকে বল, আর আমার বাবাতো বলেইছে ভারতে মাসির বাড়ি থেকেই আমাদের বিয়েটা হবে। তোমাদের কষ্ট করে আর ঢাকায় আসতে হবেনা। বুঝলে। বাঃ বাঃ কি মজা,কি মজা, হিঃ হিঃ...।

ফোনের ওপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা প্রাণোচ্ছল হাসির রেস মিইয়ে যেতে না যেতেই নীরবতা ভেঙে কর্কশ স্বরে বলে উঠলো ইরফান - দেখ আলো, সিএএ হওয়ার খবরে তোমার আনন্দ হলেও আমার হচ্ছে না। ওই খবরে হয়তো তোমার মতো লাখো আলোর আনন্দে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে। কেন কি তোমরা যাতে এদেশের নির্বিঘ্নে নাগরিকত্ব পেয়ে যাও সে ব্যবস্থাই করা হয়েছে এই অ্যাক্টে। আর লাঠি মেরেছে আমাদের মাথায়। কারণ ওই অ্যাক্টেই আমার আব্বাদের মতো যারা নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের আগে বা পরে এদেশে এসে বসবাস করছে তাদের নাকি বিদেশী চিহ্নিত করে কেড়ে নেওয়া হবে নাগরিকত্ব ? তাই আব্বার মতো অনেকেই দুঃশ্চিন্তায় ভেঙে পড়ছে কি হবে না হবে ! আর তোমার স্ফূর্তি হচ্ছে ? তুমি নিশ্চয় এটাও টিভিতে দেখেছ ওই আইনের সারা দেশ জুড়ে মানুষের বিক্ষোভ ? নিশ্চয়ই এটাও শুনেছ যে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান থেকে যে সব অমুসলিমরা এদেশে এসেছে তারা শরণার্থী ! আর যেসব মুসলমান ওই সব দেশ থেকে এদেশে এসেছে তারা অনুপ্রবেশকারী ? এটা কি তোমার কাছে খুব আনন্দের ? দীর্ঘ সত্তর-একাত্তর বছর বা তারও বেশি সময় ধরে এখানে বসবাসকারী ওই সব মুসলমানকে নতুন করে প্রমাণ দিতে হবে যে তারা প্রকৃত নাগরিক ? তোমার তো এটাও জানা আছে যে আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে আইনের চোখে ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সমান। অথচ ওই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তৈরি হয়েছে ওই সর্বনাশা আইন !

সিএএ নিয়ে ইরফানের অশনি সংকেত মুখবুজে শুনতে শুনতে হঠাৎ ওর নাগরিকত্ব পাওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেই একেবারে ড্যামকেয়ার হয়ে আলোলিকা বললে — আরে ধুর, তুমি বেকার টেনশন করছ, দেখে নিও আমার কোন প্রমাণই লাগবেনা। যাক আমার নাগরিক্ত্ব পেতে কোন সমস্যা হবে না বলেই তোমাকে কলটা করেছিলাম। আর তুমি ব্যাপারটায় গুরুত্ব না দিয়ে আমাকে ননস্টপ এতগুল কথা শোনালে। যেন কল করে অন্যায় করেছি ?

মোবাইল স্ক্রিনে অপলকে চেয়ে আলোর কথাগুলো শুনে ইরফান এবার স্বাভাবিক হয়ে বললে- দেখ তুমি যেটা ভাবছো সেটা ঠিক নয়। আসলে সর্বনাশা আইনকে কেন্দ্র করে এখানকার উদ্ভুত পরিস্থিতিটা তোমাকে জানাতেই কথাগুলো বলা। কারণ দূর থেকে প্রকৃত ছবিটা তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। একবার ভেবে দেখত ওই আইনে যদি আব্বাদের মতো অসংখ্য মুসলমানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে ! বিয়ের পর যদি আমারাও বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত হই, তখন কি হবে ? এর জন্যে হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘ সৌহার্দ্যের সম্পর্কে একটা ফাটলও তো তৈরি হবে ? যা কোন মতেই কাম্য নয়। ঠিক আছে এখন ফোনটা রাখো। একটা জরুরি ফাইল ছাড়তে হবে।

ইরফান তর্জনীর টোকায় লাইনটা অফ করতে যাবে মোবাইল স্ক্রিনে ধ্বনিত হোল আলোর দীর্ঘশ্বাস।

'গ'

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে ইরফানের মনটা কেমন যেন উড়ু উড়ু। কোন কিছুই ভালো লাগছে না। কোন রকমে টিফিনটা করেই নিজের ঘরে চুপচাপ। অন্যদিন অফিস থেকে এসে ফ্রেস হয়ে চা-টিফিন করেই বেরিয়ে পড়ত পাড়ায়। আজ মাথার মধ্যে একটাই চিন্তা কেন আলোর সাথে ওইভাবে কথা বলতে গেল। ওর তো কোন দোষ নেই। ও যা করেছে ঠিকই করেছে।

যা বলেছে ওদের দুজনের ভালোর জন্যেই বলেছে। সত্যিই বিয়ের ক্ষেত্রে এদেশে ওর নাগরিকত্ব পাওয়াটা বেশ ঝামেলারই ছিল। সিএএর দৌলতে হয়তো সেটা সুরাহা হবে সহজেই। হতে পারে আমাদের অস্তিত্বের সঙ্কটটা ওকে তেমন ভাবায়নি। তাই ও যা কিছু বলেছে, খোলা মনেই বলেছে। অহেতুক ওকে কথাগুলো না বললেই ভালো হতো। এর জন্যে আলোর কাছে এপোলজি চেয়ে নেবে। নয়তো কাল থেকে ফোন করতে ও সঙ্কোচ করবে। আজ রাতেই ভিডিও কলিং করে মাফ চেয়ে নেবে।

ইরফান মনেমনে কথাগুলো ভেবেই স্মার্টফোনটা হাতে নিয়ে দরজা থেকে পা বাড়িয়ে বেরোতে যাবে এমন সময় গোঁ গোঁ শব্দে কেঁপে উঠলো ফোনটা। চকিতে তর্জনী দিয়ে স্ক্রল করতেই স্ক্রিনে ভেসে উঠলো আলোর হাসিভরা মুখ। এতক্ষণ নিজের সাথে কসরত করা ইরফান দুঠোঁ টে হাসি ছড়িয়ে বললে- হ্যালো।

প্রত্যুত্তরে হ্যালো বলেই আলো সসঙ্কোচে বলে ওঠে — সরি ব্যাপারটা না বুঝেই আবেগের বশেই তোমায় কথাগুলি বলে ফেলেছি। সত্যিই তো তোমাদের সরকার যে আইনটা লাগু করতে চলেছে সেটা একপেশে। আমাদের যারা এদেশ ছেড়ে ওখানে গিয়ে বসবাস করছে, তারা নাকি নির্যাতিত হয়ে গেছে, বা যেতে বাধ্য হয়েছে ! আসলে তোমার সাথে কথা বলার পর আমি বাবার সাথেও বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বাবা বললেন ওসব রাজনীতির খেলা। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনেও যেসব অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটেছিল তার বেশিরভাগটাই কিন্তু ঘটিয়েছিল পাক সেনারা। আমার মামা, মাসি,দাদু-দিদারা এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল অত্যাচারিত হয়ে নয়, স্বেচ্ছায়। কারণ অবিভক্ত বাংলাতে তো উভয়ের আত্মীয়-স্বজনই বসবাস করত। উল্টে যুদ্ধের সময় বরং প্রতিবেশী মুসলিম পরিবাররাই মাসিদের নিজেদের আশ্রয়ে রেখে নিরপত্তা দিয়েছিল। যুদ্ধ মিটতেই বর্ডার পার করে দিয়েছিল নিরাপদে। সেই সঙ্গে জমিজমা ঘরবাড়ি নিজেদের দায়িত্বে রেখে পরে নাহ্যদামে কিনে নিয়েছিল তারাই। সুতরাং ওই আইনটা তৈরি হয়েছে সেটা যে কতখানি সঠিক তা সময়ই বলবে। আর হ্যাঁ, বাবা বলছিল মেসো নাকি ফোন করে বলেছে সংসদে পাস হওয়া আইনটা পুরোপুরি অমুসলিমদের হিতে কিনা সন্দেহ আছে। কেননা আসামে লাগু হওয়া এনআরসিতে তেমনটা দেখা যায়নি। যাকগে ছাড়ো ওসব কথা। আমি আবারো বলছি আমার ওই কথায় তুমি যেন রাগ করোনা না প্লিজ।

দীর্ঘ সময় ধরে ভেঁজে রাখা কথাগুলো আলোকে বলে এপোলজি চাওয়ার প্ল্যানটা ভেস্তে যাওয়ায় ইরফান বোবা হয়ে যায়। আলোর কথায় কোন জবাব না দিয়ে স্ক্রিনে জুল জুল চেয়ে থাকলে ফের আলো বললে - তুমি এখনো আমার ওপর রেগে আছো ?

লাজুক ইরফান এবার আমতা আমতা করে বললে — না না তোমার ওপর রাগ করবো কেন। আসলে আমিই চেয়েছিলাম তোমার কাছে...।

তুমি কি চেয়েছিলে আমি অনুমান করতে পারছি। তবে সেসব নিয়ে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। তার চেয়ে আমরাই বরং নতুন করে ভাবতে পারি আমাদের অদূর ভবিষ্যতের কথা।

আলোর কথায় অবাক হোল ইরফান। কি বলতে চাইছে আলো ?

কিছু না বলে এক মুহূর্ত নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে কথাগুলো ভাবছে ইরফান। হঠাৎ চমকে উঠলো আলোর কথায়। কি হোল, ভাবছো কী যাতা বকছি আমি, তাই না! শোনো এটা আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ। আমরা তো ঠিকই করেছি বিয়ে করবো বলে। আমাদের পরিবার পরিজনরাও রয়েছে আমাদের পাশে। দেখ আমার তো মনে হয় আমাদের বিয়েটা পুরাণ কালের একটা উদাহরণ হতে পারে। শুনেছি তখনকার দিনে যুদ্ধ করে পছন্দের কন্যাকে লাভ করতে হত, আর তুমি বিনা যুদ্ধেই পেয়ে যাচ্ছ তোমার ভালবাসার নারীকে। সুতরাং এটা নিয়ে তোমার আর ভাবার কোনো দরকার নাই। বাবা বলেছেন সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বরঞ্চ তোমার আব্বা-মাকে বলো চিন্তা না করতে। ঠিক আছে, ওকে গুড বাই।

'ঘ'

ভিডিও কলিং অফ হওয়ার মুহূর্ত আগেই টাচ স্ক্রিনে আলোর ফ্লাইং কিসের চক্কাস শব্দটা বিবশ করে দেয় ইরফানকে। আনমনে ইরফান স্ক্রিন থেকে মুখ তুলে উপরে তাকায়। দ্যাখে আকাশ ভরা জ্যোৎস্নায় ঝলমল চারদিক। লক্ষ কোটি তারারাও মুক্তদানার মতো লেপটে রয়েছে আকাশের আঙিনায়। দূর থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের লঘু সুর। বিসমিল্লা খাঁ কিম্বা অন্য কোন সানাই বাদকের।

সৈয়দ রেজাউল করিম

স্বর্ণ-চাঁপার উপাখ্যান

তেরে দুয়ারে খাড়া এক যোগী..... সুপরিচিত এই গানের কলিটা যন্ত্রের সুরে বেজে চলল খানিকক্ষণ। স্বর্ণ যখন ডায়মন্ডহারবার ফকির চাঁদ কলেজে পড়ত, তখন এই ছবিটা বাজারে রমরমিয়ে চলছে। এখন বেশিরভাগ লোকজন ভুলে গেছে সেকথা। ভোলেনি ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়িক কাজে লাগিয়ে দিয়েছে তারা। গানের কলিটা জুড়ে দিয়েছে কলিংবেলের সাথে। বাইরে থেকে সুইচ টিপলে ভিতর বেজে ওঠে গানের কলিটা। তেরে দুয়ারে খাড়া এক যোগী.....।

তা যোগীটা কে? তিনি আর আসার সময় পেলেন না? এই ভর দুপুরে কেউ কি কারও বাড়িতে আসে? রাগে গজগজ করতে করতে বিছানা ছেড়ে উঠলো স্বর্ণ। সামনে টেবিলের উপর রাখা চশমাটা নিয়ে ধুতির খোঁটে বারকয়েক ঘষে কানে লাগিয়ে নিল। এক টাকার ডটটা ঝুলিয়ে নিল গেঞ্জিতে। যদি পিওন আসে, যদি পাড়ার ছেলেরা চাঁদা নিতে আসে, এই সব সাত-পাঁচ ভেবে।

দরজা খুলে চমকে উঠল স্বর্ণ। কোথায় পিওন? কোথায় পাড়ার ছেলেপুলেরা? কোথায় যোগী? এ তো এক মধ্যবয়সী যোগিনী। একেবারে তার বয়সী। ফর্সা টকটকে গায়ের রং। মাথাভর্তি ঘন কালো চুল। সামনে কপালের উপরে ইন্দিরা গান্ধীর মত একগুচ্ছ সাদা চুল। চোখে সোনালি চশমা। গোলগাল মুখ। হাসিহীন। চিন্তিত। আর চিবুকের কাছে.....।

চিবুকের কাছে তিলটা খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে তাল হয়ে গেল ব্যাপারটা। সাথে সাথে ছানবিন শুরু করে দিল মাথাটা। সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগেই মাথা প্রশ্ন করে জানতে চাইল—ইনি সেই চাঁপা নয়তো ?

চাঁপার কথা মনে পড়লে এখনো বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে স্বর্ণর। চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুরানো দিনের স্মৃতি। কি অপূর্ব চেহারা ছিল চাঁপার ! যেন বৃষ্টির জলে সদ্যস্নাত গোলাপ। যেন একরাশ রূপলাবণ্য ও সুগন্ধের সমাহার। তার পটলচেরা চোখ দিয়ে ঝরে পড়তো প্রেমের আকুতি। তার চলার ছন্দে যেন বেজে উঠত সাত সুরের ঝংকার। তার সেই আগুন ঝরা রূপে প্রজাপতির মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কলেজের অনেকেই। স্বর্ণ ছিল তাদের মধ্যে একজন।

গরিব ঘরের ছেলে হতে পারে স্বর্ণ, কিন্তু তার চেহারা ছিল রাজকুমারের মত। ফর্সা টুকটুকে রং। সুঠাম দেহ। টানটান পেশি। চোখেমুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। কথাবার্তায় সপ্রতিভ। এককথায় খুব আকর্ষণীয় চেহারা।

একদিন কলেজের মেন গেটের পাশে চাঁপা গাছটা পেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ স্বর্ণর চোখে পড়ল সামনে চাঁপা যাচ্ছে। তাকে একাকি দেখে স্বর্ণ মৃদু স্বরে ডাকল --চাঁপা.. !

সে ডাক কানে গেল চাঁপার। পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। রাজহাঁসের মত ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। স্বর্ণকে দেখে রাগ সপ্তমে উঠল তার। দুটো কথা শুনিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল চাঁপার। কিন্তু সে সুযোগটা আর হলো না। তার আগেই স্বর্ণ বলে বসলো—তোকে আমার খুব ভালো লাগে চাঁপা।

— সে তো সবারই লাগে। তাতে হয়েছেটা কি?

সামান্য আগুনের ছোঁয়ায় দাহ্যপদার্থ যেমন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি জ্বলে উঠল চাঁপা। বিনে পয়সায় হাসি বিলানো মুখটা হঠাৎ লোহার মত কঠিন হয়ে উঠল। শক্ত হয়ে উঠল তার দুই চোয়াল। কিন্তু সে সব কিছু তোয়াক্কা করল না স্বর্ণ। সোজা কথা সোজা ভাবে বলা তার অভ্যাস। তবে তা কাকুতি-মিনতি করে নয়। প্রয়োজনে দৃঢ়তার সাথে। কতকটা সেভাবেই স্বর্ণ বলল-- তোকে আমি বিয়ে করতে চাই।

— বিয়ে?

চোখ মুখ বাঁকিয়ে চাঁপা বলল — বিয়ে করে বউকে খাওয়াবি কি ? রাখবি কোথায় ? একবারও কি সেসব কথা ভেবে দেখেছিস?

স্বর্ণ নিরুত্তর। চাঁপার মুখ দিয়ে তখনো ঝরছে জ্ঞানগর্ভের আগুন।

— আগে নিজের পায়ে দাঁড়া। একটা ঘরবাড়ি কিছু তৈরি করে দেখা। তারপর না হয় বিয়ের প্রস্তাব.....।

সেদিন আরো অনেক কটু কথা শুনতে হয়েছিল স্বর্ণকে। দুচোখ বেয়ে অবাধ্য জল গড়িয়ে পড়েছিল তার। আর পিচকারির মতো একরাশ পানের পিক ফেলে কোমর দোলাতে দোলাতে চাঁপা চলে গিয়েছিল তার সামনে দিয়ে। ভুলেও পিছন ফিরে তাকায়নি একবারও। সেই চাঁপা আজ তার দুয়ারে! তা হঠাৎ কি মনে করে এসেছে চাঁপা? মনের মধ্যে ঝড় উঠল স্বর্ণর। সেদিনের সেই ঘটনায় চাঁপা চিনতে পারেনি তো? প্রতিশোধ নিতে এখানে আসেনি তো? তাই বাকরুদ্ধ, অপরিচিতের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল চাঁপার দিকে।

চাঁপার দিকে তাকাতেই কতকটা বিনয়ের সুরে সে বলল— একটা বাড়িভাড়ার সন্ধানে আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনি যদি দয়া করে.....।

চাঁপার গলার স্বর এখনো সেই রকম। খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। চেহারায় কিছুটা রদবদল হলেও পাল্টে যাইনি একেবারে সবকিছু। এখনো বজায় আছে সেই হাসি। সেই দেহ সৌষ্ঠব। তবে সেই দাম্ভিকতা বেশ কিছুটা ম্রিয়মাণ। বোধহয় বয়সের দোষে।

স্বর্ণকে চিনতে পারেনি চাঁপা। চিনতে পারাটাও মুখের কথা নয়। বয়সের সাথে সাথে চেহারার ও বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে স্বর্ণর। তার উপরে গাল ভর্তি দাড়ি গোঁফ, চোখের সামনে ঝুলে থাকা চশমা, একান্ত অন্তর্ভেদী দৃষ্টি না হলে তাকে খুঁজে বার করাটা বেশ মুশকিল। কিন্তু গলার স্বর? স্বর্ণ সাবধান হলো। এই মুহূর্তে বোধ হয় ধরা দেওয়াটা উচিত হবেনা তার। একটু বুঝতে পারলেই সমস্যা হতে পরে। তাই বেশ সতর্কতার সাথে স্বর্ণ বলল—আপনারা মোট ক'জন থাকবেন?

—আমি একাই থাকব। ছোট্ট একটা শোবার ঘর, একটা রান্নাঘর, আর একটা বাথরুম হলেই চলবে।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বার হল চাঁপার বুকের ভিতর দিয়ে। পরক্ষণে হিংসায় জ্বলে উঠল চোখ দুটো। কঠিন হয়ে উঠল তার দুই চোয়াল। গনগন করে জ্বলে উঠল তার মনের আগুন। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না চাঁপা। তারপর কোনক্রমে সামলে নিলো নিজেকে। একসময় আক্ষেপের সুরে বলল— আপন বলতে আমার কেউ নেই। একটা ছোট-খাটো কাজ করি। সময়মতো হাজিরা দিতে হয়। কিন্তু গাঁয়ের বাড়ি থেকে প্যাসেঞ্জারি করাটা বড় কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে। সময় মতো....।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বার হল চাঁপার বুকের ভিতর দিয়ে। পরক্ষণে হিংসায় জ্বলে উঠল চোখ দুটো। কঠিন হয়ে উঠল তার দুই চোয়াল। গনগন করে জ্বলে উঠল তার মনের আগুন। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না চাঁপা। তারপর কোনক্রমে সামলে নিলো নিজেকে। একসময় আক্ষেপের সুরে বলল— আপন বলতে আমার কেউ নেই। একটা ছোট-খাটো কাজ করি। সময়মতো হাজিরা দিতে হয়। কিন্তু গাঁয়ের বাড়ি থেকে প্যাসেঞ্জারি করাটা বড় কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে। সময় মতো....।

— কিন্তু একা মহিলাকে তো আমি বাড়ি ভাড়া দেব না।

— এসব অবান্তর কথা কেন তুলছেন আবার? আমি তো আর যুবতী মেয়ে নই যে আমার জন্য আপনি চিন্তা ভাবনা করবেন। এখন আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। পাক ধরেছে চুলে। তাছাড়া আমি..... বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল চাঁপা। এসব কথা অচেনা অজানা লোককে না বলাই শ্রেয় ভেবে।

বাড়ির মালিক তার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে দেখে সম্বিত ফিরে পেল চাঁপা। না বলতে চাওয়া কথাটার সামঞ্জস্য আনতে তড়িঘড়ি করে চাঁপা বলল— তাছাড়া আমি আর কতক্ষণ থাকব এই বাড়িতে? রোজ সকালে বেরিয়ে যাব, ফিরব সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা আটটা। শনি-রবিবার বাপের বাড়িতে। বাড়িভাড়া মাসের দু-তিন তারিখের মধ্যে দিয়ে দেব। তাহলে আর অসুবিধাটা কোথায়? ভয়টা কি?

—সে তো সব বুঝলাম। ভয় আপনার নয়, ভয় আমার। আপনাকে এই বাড়ি থেকে যাতায়াত করতে দেখলে পাড়া-প্রতিবেশীরা আমাকে কি বলবে? বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে। ভাড়া দেবার নাম করে কাকে তুলে এনেছে। এই বয়সে এসব অবান্তর কথা কে শুনতে চায় বলুন?

— দু'বার চোখ ঝামটে, চোখ দুটো বড় বড় করে, একরাশ বিস্ময়ের সাথে চাঁপা বলল—আপনি এখনো বিয়ে করেননি ? ঘরে আপনার কেউ নেই?

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বর্ণ বলল— বিয়ে তো করতে চেয়েছিলাম,কিন্তু বিয়ে আর হল কোথায়? পাড়া- প্রতিবেশী সকলে পছন্দ করলেও হবু কনের পছন্দ হলো না। তাই আর বিয়ে করা হলো না।

—কি যে বলেন আপনি? প্রতিবাদের সুরে চাঁপা বলল— বেচা-কেনার হাটে মেয়েরা তো পরীক্ষা দেয় শুনেছি, পুরুষেরা কখনো দেয় বলে শুনিনি। তাছাড়া এই বয়সে আপনি এখনো এতো হ্যান্ডসাম, যৌবনকালে তো আরো বেশি সুন্দর ছিলেন। সেইসময় আপনাকে দেখে.....না না, এরকম মিথ্যা কথা বলবেন না। আপনি মিছেমিছি মেয়েদের নামে দুর্নাম করবেন না। একটা দুটো মেয়ে কি বলল না বলল তার উপর নির্ভর করে সব দায় মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন, এটা ঠিক নয়। এ দুনিয়ায় কি আর অন্য কোন মেয়ে ছিল না?

স্বর্ণ কোন জবাব দিল না। শ্রবণশক্তিহীন পাথরের মূর্তির মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। তার ভাবলেশহীন মুখখানা দেখে কিছুই অনুমান করতে পারল না চাঁপা। নিরাসক্ত মানুষটাকে কথার জালে কোনভাবেই আসক্ত করতে পারল না। অথচ এই মুহূর্তে তার একটা বাড়ির প্রয়োজন। তা না হলে.....।

স্বর্ণ মনে মনে চিন্তাভাবনা করল বেশ কিছুক্ষণ। গভীরভাবে ভেবে দেখল চাঁপার অসহায় অবস্থার কথা। তার বিপদের কথা। এতকিছু কথা ভেবেও সে নির্বিকার কেন? সে তার প্রস্তাবে রাজি হয়নি তাই? প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই তার এই চাল? যদি তাই হয় তাহলে তার সাথে একটা পশুর পার্থক্য কোথায়? ক্ষমা করা মানুষের ধর্ম। যে ক্ষমা করতে শেখেনি, সে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমার অযোগ্য। কোনকিছু না জেনে শুনে চাঁপার প্রতি তার এই দণ্ডাদেশ কেন? তার বাড়িতে আরো বেশ কয়েকজন ভাড়াটিয়ারা বাস করছে। তারা যেমন ভাড়া দিয়ে থাকে চাঁপাও ভাড়া দিয়ে থাকবে। সে তো বিনা পয়সায় থাকতে চাইছে না। তাকে তো গলা জড়িয়ে বলছে না, আমাকে তুমি বিয়ে করো। তাহলে তাকে থাকতে দিতে আপত্তি কেন? এরকম আরো অনেক কঠিন প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল স্বর্ণকে।

তাকে চুপচাপ থাকতে দেখে চাঁপা তাড়া দিল। অনুনয়ের সুরে বলল— দয়া করে আপনি চুপ করে থাকবেন না। কিছু একটা বলুন।

স্বর্ণ আমতা আমতা করে বলল— আসলে আমি দিন দশেকের জন্য একটু বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে....।

— ঠিক আছে, তাই হবে। দিন দশ বারো পরে এসে আমি খোঁজখবর নেব। তবে দয়া করে আমার জন্য.....।

চাঁপা পিছন ফিরতেই সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল স্বর্ণ। পিপাসায় গলাটা শুকিয়ে উঠেছে তার। চোখ ঘোরাতেই নজরে পড়ল ফ্রিজের মাথায় রাখা আছে জল ভরা বোতলটা। সেটা খুলে বেশ খানিকটা জল প্রাণভরে খেয়ে নিল। পেট ভরল।

তৃষ্ণা মিটল। কিন্তু মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকল চাঁপার মুখ।

স্বর্ণ বিছানায় গা এলিয়ে দিল। চোখ দুটো বুজিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল। টিকটিক করে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলল। কিন্তু চোখে ঘুম এলো না। আর ঘুম না এলে যা হয়, তাই শুরু হল। একরাশ ভাবনা এসে জুটল তার মাথায়। প্রশ্নবানে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল তাকে। চাঁপা হঠাৎ এরকম ভাবে বাড়ি খুঁজছে কেন? ওদের তো দশ জায়গায় দশটা প্রাসাদসম বাড়ি ছিল। গোটা পাঁচেক গাড়ি ছিল। দুটো কারখানা, প্রচুর জমিজমা ছিল। কি এমন হলো, যার জন্য সবকিছু বিষয়-আশয় ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে..... ভাবতে গিয়েই চোখের সামনে চাঁপার নিষ্পাপ মুখটা ভেসে উঠল আবার। কপাল কুঁচকে, মাথার চুলে বেশ কয়েকবার আঙুল চালিয়ে স্বর্ণ ভেবে দেখল। না, মাথায় তো কোন সিঁদুর ছিল না চাঁপার। তাহলে আর কি সে বিয়ে করেনি। চাঁপা কি এখন বিতাড়িত? তার কোন ছেলেপুলে.....!

হ্যাঁ, হলেও হতে পারে। স্বামীর মৃত্যুর পর, স্বামীর বাড়ির লোকজনেরা সাধারণত পালটে যায়। রং বদলে যায় গিরগিটির মত। আত্মীয়-স্বজনেরা যেন কেমন পর হয়ে যায়। যে অধিকার বলে সে শ্বশুরবাড়িতে, বাপের বাড়িতে বিরাজ করত, তা বহুলাংশে খর্ব হয়ে যায়। দয়া, মায়া, ভালবাসা সব কর্পুরের মত উবে যায়। ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে তীর্যকতার তীর বিঁধিয়ে দেয় প্রতিটি পদে।

বাপের বাড়িতে এলেও তাই। দাদা বৌদিরা সন্দেহ করে। কেনো শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এলো? মা-বাবার সম্পত্তির ভাগ নিতে এসেছে নাকি? এরকম অনেক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় ভুক্তভোগীকে। সেটাই হয়তো ঘটেছে চাঁপার ভাগ্যে। চাঁপাও হয়তো সহ্য করতে পারেনি এইসব অবিচার, অত্যাচার। তাই....।

এসব কথা ভাবতে গিয়ে ভাবনাকে হঠাৎ গলা টিপে ধরে স্বর্ণ। সে কেন মিছে মিছি চাঁপার সম্বন্ধে এত কিছু ভাবছে? যে মেয়েটা তার যৌবনকালে অত্যন্ত ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে, তার পৌরষত্বে আঘাত দিয়ে নানারকম আজেবাজে কথা বলেছে, তার সম্বন্ধে এত কি ভাবার আছে? সে সুখে থাক, দুঃখে থাক, তাতে তার কি আসে যায়? এই পৃথিবীতে তো আরো অনেক মানুষ আছে, অনেক নারী আছে, তাদের নিয়ে তো সে একবারও ভাবছে না। তাহলে কেন সে মিছিমিছি.....। সেকথা ভাববে না বলে মনস্থির করলেও ভাবনা এসে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে বলে স্বর্ণর মনে হয়। যৌবনকালের আক্ষেপ বশত যে কাজটা সে করেছিল চাঁপাকে পাওয়ার জন্য সে কাজটা পৌঢ়ত্বের দুয়ারে এসে মনে হচ্ছে, এ দুষ্কর্মটা করা উচিত হয়নি তার।

বিছানায় উসপাশ করতে থাকল স্বর্ণ। চাঁপার ভাবনা মন থেকে তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাবে বলে পণ করল। কিন্তু তা সম্ভবপর হল না। বরং চাঁপার উপস্থিতি আরো বেড়ে গেল

দোতলার ঘরে ঢুকে বিস্ময়ে ভিমরি খাবার যোগাড় হল আমার। অদ্ভুত এক ভয়াবহ শিহরণে শজারুর মত খাড়া হয়ে উঠল আমার দেহের প্রতিটি লোমকূপ। এত বছর পুলিশ প্রশাসনে চাকরি করেছি, কিন্তু এইরকম ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সম্মুখীন হইনি কখনো। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে দেখলাম শ্বেতশুভ্র বিছানায় অবিন্যস্তভাবে শুয়ে আছে বাড়ির মালিক। তার কাটা মাথাটা ঘাড়ের সাথে কোনক্রমে ঝুলে আছে খাটের একপাশে। মাংস কাটার একটা ভারি চপার পড়ে আছে বিছানায়। সেই বিছানার বেশ কিছুটা অংশ রক্তে ভিজে আছে গাঢ় লাল পতাকার মত। মৃতদেহের মাথার দিকে ফ্যানের সাথে কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে এক পৌড় মহিলা। সত্যপ্রকাশ আইডেন্টিফাই করল মৃত পৌড় লোকটি হলেন স্বর্ণ এবং মহিলা হলেন চাঁপা। তাঁর একজন নতুন ভাড়াটিয়া।

তার অবচেতন মনে। তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কঠিন কঠিন প্রশ্ন ছুড়ে দিতে থাকল।

— ওহে মিঃ স্বর্ণ! আপনি আপনার বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, সত্যি কি আপনি চাঁপাকে ভুলতে পেরেছেন? কেন আপনি আপনার মনের মনিকোঠায় তাকে এতদিন সযত্নে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন? কেন আপনি বিয়ে না করে তীর্থের কাকের মত আজও বসে আছেন? কবে চাঁপা ফিরে আসবে তার প্রতীক্ষায়? কেনই বা অমন ভয়ঙ্কর বাস্তবের পথে পা রাখলেন!

আরো অনেক কঠিন প্রশ্ন মাথচাড়া দিল। সেসব প্রশ্নের উত্তর দেবার মত ক্ষমতা ছিল না স্বর্ণর। সত্যি কথা বলতে কি, স্বর্ণ চাঁপাকে নিজের মতো করে না পেলেও সগর্বে তার হৃদয় বিরাজ করেছিল এতদিন। অত্যন্ত গোপনভাবে। আজ হঠাৎ চোখের সামনে চাঁপাকে দেখে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মত হঠাৎ জেগে উঠল স্বর্ণর হৃদয়।

স্বর্ণ-চাঁপার এই উপাখ্যান শুনতে শুনতে আপনার মনে হল, এটা একটা নিছক প্রেম কাহিনি। ভালবাসার গল্প। কিন্তু এ ধরনের গল্প লেখার তো কোন প্রয়োজন নেই আমার। যেটা প্রয়োজন, সেটা হল একটা গোয়েন্দা বা রহস্য গল্পের। যেটা প্রকাশিত হবে উজ্জীবন পত্রিকায় আগামী কোন সংখ্যায়। সেটাই সম্পাদকের ইচ্ছা। সেই গল্পের রসদ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম যতীন দারোগার দরবারে। কিন্তু....।

আমার এই অস্বস্তি, এই উচাটন মনোভাব উপলব্ধি করে যতীন দারোগা বললেন—এবার তাহলে শুরু করি আপনার আকাঙ্ক্ষিত অধ্যায়।

যতীন দারোগার কথা শুনে আমার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চায়ের পেয়ালায় শেষচুমুক দিয়ে বলতে শুরু করলেন যতীন দারোগা— এখন প্রায় একশ কুড়ি কোটির দেশ আমাদের। এই দেশের মাটিতে যে কত স্বর্ণ-চাঁপা ফুটে আছে, তার হিসাব রাখা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু বারুইপুরের এই স্বর্ণ চাঁপার বাড়ির খবর একদিন চলে এলো থানাতে। খবরটা এসেছিল একটু অন্যভাবে। সেদিন রাত বারোটা নাগাদ পদ্মপুকুর এলাকায় হঠাৎ ভীষণভাবে বোমবাজি শুরু হলো। রাতদুপুরে সহসা বোমবাজি কেন? কোন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়তো? মাসকয়েক আগে থেকে একটা জায়গার দখল নিয়ে দুই ক্লাবের দ্বন্দ্ব চলছিল। এটা তার ফলশ্রুতি নয় তো? এই নিয়ে যখন চিন্তাভাবনা করছিলাম,তখন খবর এলো, ডাকাত পড়েছে। এখবর পেয়ে মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে অফিসার ফোর্স নিয়ে পৌঁছে গেলাম পদ্মপুকুরে। ডাকাতদের ধরার জন্য এ গলি সে গলিতে ছানবিন শুরু করে দিলাম। দাগি আসামিদের বাড়িতে রেইড করলাম। ডাকাতি হওয়া দুটো বাড়িতে সরজমিনে তদন্ত করলাম। সব কাজ সেরে ভোরবেলায় থানায় ফেরার পথে হঠাৎ আমাদের গাড়িটা আটকে দিল একটা লোক। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—স্যার! আমাদের এই বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। বাড়ির মালিক ও এক ভাড়াটিয়াকে খুন করে গেছে।

লোকটার নাম সত্যপ্রকাশ। মালিকের বাড়িতে সেও ভাড়াতে থাকে। তার কথা শুনে টনক নড়ে গেল আমার। পুলিশ প্রশাসনে সর্বোচ্চ 'হিনিয়াস ক্রাইম" হিসাবে ধরা হয় "ডকোইটি উইথ মার্ডার" ঘটনাকে। "পেনাল কোডে" এর সাজাও সর্বাধিক। তাই এস.ডি.পি.ও. সাহেবকে খবরটা দিয়ে সত্যপ্রকাশের সাথে আমরা হাজির হলাম সেই বাড়িতে।

দোতলার ঘরে ঢুকে বিস্ময়ে ভিমরি খাবার যোগাড় হল আমার। অদ্ভুত এক ভয়াবহ শিহরণে শজারুর মত খাড়া হয়ে উঠল আমার দেহের প্রতিটি লোমকূপ। এত বছর পুলিশ প্রশাসনে চাকরি করেছি, কিন্তু এইরকম ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সম্মুখীন হইনি কখনো। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে দেখলাম শ্বেতশুভ্র বিছানায় অবিন্যস্তভাবে শুয়ে আছে বাড়ির মালিক। তার কাটা মাথাটা ঘাড়ের সাথে কোনক্রমে ঝুলে আছে খাটের একপাশে। মাংস কাটার একটা ভারি চপার পড়ে আছে বিছানায়। সেই বিছানার বেশ কিছুটা অংশ রক্তে ভিজে আছে গাঢ় লাল পতাকার মত। মৃতদেহের মাথার দিকে ফ্যানের সাথে কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে এক পৌঢ় মহিলা। সত্যপ্রকাশ আইডেন্টিফাই করল মৃত পৌঢ় লোকটি হলেন স্বর্ণ এবং মহিলা হলেন চাঁপা। তাঁর একজন নতুন ভাড়াটিয়া।

একথা বলে একটু থামলেন যতীন দারোগা। বুঝতে পারলাম পুরানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বেশ কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। তাঁর বিহ্বল কাটাতে অন্য প্রসঙ্গ টেনে বেশ কিছুক্ষণ কথা বললাম তাঁর সঙ্গে। ক্রমে তিনি স্বাভাবিকতায় ফিরে এলেন। একসময় আমি যতীন দারোগার চোখে চোখ রেখে শুধালাম— ডাকাতরা কি ধরা পড়েছিল? স্বর্ণ-চাঁপার আকাঙ্ক্ষিত অপরিণত প্রেম কি পূর্ণতা পেয়েছিল? সে ব্যাপারে কেউ কি কিছু বলেছিল? নিশ্চয়ই এই খুনের

ব্যাপারে ওদের আত্মীয় স্বজনরা কেউ না কেউ জড়িত ছিল?

আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় শুনে মুখ মুচকে নিঃশব্দে হাসলেন যতীন দারোগা। একসময় বললেন— কথায় বলে মানুষ ভাবে এক, ঈশ্বর করেন আর এক। কথাটা বর্ণে বর্ণে ফলে গিয়েছিল এই ঘটনার ক্ষেত্রে। আমরা সকলে ভেবেছিলাম কি নিষ্ঠুর, কি নির্মম, কি হিংস্র বারুইপুরের ডাকাতেরা! সামান্য কিছু টাকাপয়সার জন্য, সোনাদানা, অর্থের জন্য তারা অত্যন্ত জঘন্যভাবে খুন করে গেল দু'জন জলজ্যান্ত মানুষকে? কিন্তু সে আশঙ্কা, সে চিন্তা ভাবনা ভ্রান্ত প্রমাণিত হল একটু পরেই। মৃতদেহ দুটির সুরথহাল রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে। মৃতের দেহতল্লাশী নেবার সময় চাঁপার শাড়ির আঁচলের খোঁটে পাওয়া গেল একটা চিঠি। সেই চিঠিটা থানার বড়বাবুকে উদ্দেশ্য করে লেখা। চিঠি পড়ে বোঝা গেল চাঁপাই খুন করেছে স্বর্ণকে।

একথা শুনে আমার গাল হা হয়ে গেল। চোখদুটো বড় বড় করে যতীন দারোগাকে শুধালাম— তার মানে? চাঁপা হঠাৎ স্বর্ণকে খুন করতে গেল কেন? তাহলে কি চাঁপার অসম্মতি সত্ত্বেও তার দুর্বলতার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল স্বর্ণ?

যতীন দারোগা বললেন— না না, ওসব কিছু নয়। চাঁপা অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায়, ভাবনা চিন্তা করে খুন করেছে স্বর্ণকে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

একরাশ বিস্ময় চোখে আমি শুধালাম— তার মানে?

যতীন দারোগা বললেন— কেন খুন করেছে সেটাই জানতে চাইছেন তো?

আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম। তা লক্ষ্য করে যতীন দারোগা বললেন— তাহলে বড়বাবুকে লেখা চাঁপার শেষ চিঠির কিছু অংশ আপনাকে শোনাই। চাঁপা লিখেছে— আমার মৃত স্বামীর চোখের তারায় দেখেছি স্বর্ণকে খুন করতে। আমাকে আপন করে পাবার আশায় স্বর্ণ যে এভাবে তাকে খুন করতে পারে তা ছিল আমার কল্পনার অতীত। আমার মনে তখন একটা প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। আমার ভালোবাসার মানুষকে যে এভাবে খুন করেছে, তাকে যেভাবেই হোক সরিয়ে দিতে হবে এই দুনিয়া থেকে। সেই সংকল্প নিয়ে শ্বশুরবাড়ির রাজ বৈভব ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি আমি। দীর্ঘ ত্রিশ বছর পথে পথে ঘুরেছি আমি। অবশেষে স্বর্ণকে খুঁজে পেলাম এই বারুইপুরে। ভাড়াটিয়া হিসাবে গত একমাস কাটিয়েছি ওর বাড়িতে। ও ভেবেছে আমি ওকে চিনতে পারিনি। কিন্তু আমি তো আমার স্বামীহন্তাকে আজও ভুলতে পারিনি। তাই আজ ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে খুন করে তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে আমার মন। আমি আনন্দের সাথে একটু পরেই আত্মহত্যা করব। ওপারে আজও অপেক্ষা করছে আমার স্বামী। তার সাথে গিয়ে মিলব।

এ কথা বলে যতীন দারোগা একটু থামতেই নিজেকে আর সংযত করতে পারলাম না আমি। স্বগতোক্তি করার মত বললাম— বড় ভুল করেছে চাঁপা। স্বর্ণর সাথে সম্বন্ধ পাতিয়ে সুখে ঘর সংসার করতে পারত। কালনাগিনীর মত এরকম আচরণ করাটা উচিত হয়নি তার।

আমার কথায় যতীন দারোগা কি বুঝলেন কে জানে? তিনি বললেন-- আমিও শুনেছি, স্বামীর চোখের তারায় তার মৃত্যুর কারণ দেখে কালনাগিনীরা প্রতিশোধ নিতে ছুটে যায়। কিন্তু প্রচলিত সে কথায় বিশ্বাস হয় না আমার। ব্যাপারটা নিয়ে সাইকোলজিস্টদের সাথে একটু আলাপ আলোচনা করেছিলাম। তাদের মতে—আমাদের সমাজে দু'রকম চরিত্রের মানুষের সন্ধান মেলে। একটি হল পলিগোমাস (Polygamous), অন্যটি হল (Hetero gamous) হেটারোগোমাস। পলিগোমাস চরিত্রের লোক জনদের বহুবিবাহে বা অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে বিন্দু মাত্র অসুবিধা হয় না। কিন্তু হেটারোগোমাস চরিত্রের মানুষেরা বেশীরভাগ স্বামী বা স্ত্রী অন্ত প্রাণ। কোনদিনই তারা ভুলতে পারে না তাদের আরাধ্য দেব/দেবীকে। চাঁপা ছিল সেই গোত্রের। স্বভাবতই প্রতিশোধ নিতে খুন করা বা আরাধ্য দেবতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা তাদের কাছে মহামূল্যবান হয়ে দাঁড়ায়।

মাজরুল ইসলাম

মুর্শিদাবাদ : আমদরবারে নবাব

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭, আলেকজান্ডার সিন্ধু উপত্যকায় আম দেখে ও খেয়ে ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিলেন। ওই সময় আম ছড়িয়ে পড়েছিল মালদ্বীপ, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও মাদাগাস্কারে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬৩২ থেকে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণে এসে বাংলাদেশের আমকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পরিচিত করান। মুর্শিদাবাদে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁনের সময়কাল থেকে আমের রমরমা থাকলেও নবাব সুজাউদ্দিন বিভিন্ন দেশ থেকে নামীদামি আমের চারা আমদানি করে উন্নত কলম আমের প্রচলন করেন।

আমের বৈজ্ঞানিক নাম 'ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা'। এর জন্মস্থান ও বয়স নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক আছে। সাধারণভাবে আমের আদি নিবাস বা জন্মস্থান দক্ষিণ এশিয়া বলে মনে করা হয়। ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে আফ্রিকায় আম চাষের প্রচলন হয়। এরপর ১৬ শতাব্দীতে পারস্য উপসাগরে, ১৭ শতাব্দীতে ইয়েমেনে ও ইংল্যান্ডে,১৯ শতাব্দীতে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে, ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে আম চাষের খবর পাওয়া যায়। কারও কারও মতে ৪০০০ হাজার বছর পূর্বে কোথাও কোথাও আমের খোঁজ ছিল। সে যাই হোক, এখন আম বিশ্ববাসীর ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। পৃথিবীতে বহু প্রজাতির আম আছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায় মুঘল সম্রাট আকবর ভারতের শাহবাগের দ্বারভাঙ্গায় একলক্ষ আমের চারা রোপণ করে উপমহাদেশে প্রথম উন্নত জাতের আম বাগান গড়ে তোলেন। অতঃপর মুর্শিদাবাদে আমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন নবাবরা।

বাংলায় আম শব্দটি সংস্কৃত আম্র থেকে উদ্ভুত। ভারত ও পাকিস্তানের জাতীয় ফল আম। আর বাংলাদেশের জাতীয় গাছ। আমের জন্য মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলা বিখ্যাত। মালদহ উৎপাদনের দিক থেকে এগিয়ে থাকলেও স্বাদ ও গন্ধের সাপেক্ষে এগিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার আম। এখানকার জিভে জল আনা নানা জাতের সুস্বাদু আম বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে দিন দিন। মুর্শিদাবাদে একসময় ২৫০ থেকে ৩০০ রকম আমের দেখা মিলত। এই জেলায় আমের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন সৌখিন নবাব সুজাউদ্দিন। তাঁর

লালবাগ সহরের মধ্যে সেরা আমের বাগান হল রাইসবাগ। এখনও বিদ্যমান। এই বাগানে নানা ভালো ভালো জাতের আম আছে। আম সংরক্ষণের জন্য চকবাজারে নবাবদের আম্বাখানা বা আমতারাশ ছিল। এখন আম, আমজনতার বা হাটুরে ফলে পরিণত হয়েছে।

আমলেই আমের যত বাড় বাড়ন্ত। তিনি দেশবিদেশ থেকে উন্নত জাতের কলম নিয়ে এসে সুবিশাল আমবাগান গড়ে তোলেন। সে সব আমের নাম রাখা হত আমের বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ বুঝে—যেমন কোহিতুর,চিনিচম্পা, রানিপসন্দ, সাদুল্লা, রানি, ভবানী, বোম্বাই, দিলশাদ, মোলায়েমজাম, বিমলি, কালাপাহাড়, বিরে, সিঁদুরে, আনারস,মিছরিদানা, গোপালভোগ, মোহনভোগ, কিষানভোগ, নবাবপসন্দ, খিরসাবতী, মল্লিকা, আম্রপালি, বেগমপসন্দ,ল্যাংড়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুর্শিদাবাদে নবাবি আমলে আম ছিল এক এলাহি ব্যাপার। বৈশাখ মাস থেকে আম পাকতে শুরু করে আর শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে শেষ হয়। লম্বা সরু বাঁশের মাথায় ঝোকা (লোক ভাষা) বেঁধে গাছ থেকে আম পেড়ে ঘরে নিয়ে এসে জাগ দেওয়া হয়। এতে আমের গায়ে হলুদ রং ধরে, সুস্বাদু হয়ে ওঠে। নবাবরা তুলোয় মুড়ে আম্বাখানায় আম পাকাতে দিতেন। এখন ঔষধের সাহায্যে নানা ভাবে আম পাকানো হয়। এখনকার মতো তখন হিমঘর বা ফ্রিজ ছিল না। আম সংরক্ষণ করা হত বিশেষ পদ্ধতিতে। আমের বোঁটায় গরম মোম লাগিয়ে সেই আম খাঁটি গাওয়া ঘি কিংবা খাঁটি মধুতে ডুবিয়ে রেখে সারা বছর ধরে পাকা আম খাওয়ার চল ছিল তখন। আম সংরক্ষণ করার জন্য 'আম্বাখানা' থাকত। গাছ থেকে আম পাড়ার সময় যেন আছাড় না খায় তার জন্য দক্ষ গাছালি দিয়ে যত্নসহকারে আম পাড়া হত। গাছালিরা হাতে তুলোর মোজা পরে আম পাড়ত।

মুর্শিদাবাদে লালবাগের আশপাশে প্রচুর পরিমাণে আম বাগান ছিল। এখনও তার কিছু কিছু বিদ্যমান। আম গাছ সাধারণত লম্বায় ৩৫-৪০ মিটার এবং ১০ মিটার পর্যন্ত গোলাকৃতির হয়। বাঁচে বহু বছর। প্রায় ৩০০ বছর ধরে ফল দান করে। আমের জাত ভেদে হলুদ, কমলা, লাল ও সবুজ রঙের হয়। তখন আম নিয়ে কত না সামাজিকতা, আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব চলত। ঝুড়ি ভর্তি আম বন্ধুর বাড়ি, আত্মীয় বাড়ি ও কুটুম বাড়ি পাঠানো হত বাঁকে করে।

মুর্শিদাবাদকে দুভাগে ভাগ করেছে ভাগীরথী নদী। ভাগীরথীর দুপাড়েই আমের বাগান চোখে পড়ে এখনও। অবশ্য জেলা জুড়েই কমবেশি আমবাগান রয়েছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে লালবাগ মহকুমায় ৩৪৪৩ হেক্টর, জঙ্গিপুর মহকুমায় ৩২৩৫ হেক্টর, ডোমকল মহকুমায় ১৬৬৪ হেক্টর, বহরমপুর মহকুমায় ১৬৬৫ হেক্টর এবং কান্দি মহকুমায় ৩০০ হেক্টর জমিতে আম বাগান আছে। মাটির গুণে লালবাগ মহকুমায় ও জঙ্গিপুর মহকুমায় আমের ফলন সব চাইতে বেশি।

মুর্শিদাবাদের আমের খ্যাতি পৃথিবী জুড়ে। প্রত্যেক আমের স্বাদ আলাদা আলাদা। এক এক নবাব এক এক রকম আম খেতে ভালবাসতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নবাব ফেরাদুন জাঁ আমের চারার জন্য তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরই এক কর্মচারীর কন্যার সঙ্গে। মোদ্দা কথা ছেলের বিয়েতে আমের চারা যৌতুক হিসেবে নিয়েছিলেন। সে আমটির নাম 'মির্জা পসন্দ'। বাঁশের চুঁচ বা রূপোর ছুরি দিয়ে কেটে আম খাওয়ার চল ছিল অভিজাত সমাজে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পছন্দের আম ছিল কোহিতুর।

বিভিন্ন রকমের আমের নাম ও সামগ্রিকভাবে আম নিয়ে রয়েছে মজার মজার সব গল্প :

কোহিতুর: নবাবরা এই আম তুলো দিয়ে জড়িয়ে রাখতেন। বারো ঘণ্টা অন্তর উল্টে রাখা হত। এখন কোহিতুর আম দুষ্প্রাপ্য। নবাব সুজাউদ্দিনের আমল থেকে রয়েছে এই আম। এক সময় কাসিমবাজারের বাগানে প্রচুর কোহিতুর আম হত। বর্তমান একটি কোহিতুর আমের দাম প্রায় ১৫০০-১৬০০ টাকা। তখন নবাব ও অভিজাত শ্রেণির লোকেরা খেত এই আম।

মির্জা পসন্দ : এটা নবাব দরবারের আশেপাশে লাগানো হত। যেন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে, নবাব নাজিম ফেরাদুন জাঁ পদাধিকারী এক কর্মচারীর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছিলেন এই

আম গাছ। তাই এর নাম মির্জা পসন্দ। এনায়েত পসন্দ, নবাব পসন্দ, দিল পসন্দ, মির্জা পসন্দ, রাণী পসন্দ, সবদার পসন্দ প্রভৃতি আমের নামের জন্য এনায়েত খাঁন নামে একজন ওমরাহ চিরজীবী হয়ে আছেন।

বিমলি : মীরজাফর আলী খাঁনের আমলে এক পরিচারিকার নাম ছিল বিমলি। তিনি নিত্য নতুন আম গাছ লাগাতেন। এই পরিচারিকার নামানুসারে এক শ্রেণির আমকে বিমলি আম বলা হয়।

সরঙ্গা: নবাবের হাভেলিতে সারঙ্গি বাদকদের কথা ভেবে এই আমের নাম রাখা হয় সরঙ্গা।

খিরসাবতী : ময়মনসিংহের মহারাজা সুতাংশু কুমার আচার্য বাহাদুর চাঁপাই নবাবগঞ্জ এলাকায় পরিপাটি করে গড়ে তোলেন একটি আমবাগান। সেই বাগানেই অন্যান্য উন্নতমান আমের সঙ্গে চাষ হত খিরসাবতী আমের।

আশ্বিনা : কালো রঙের আম। যখন সব শেষ হয়ে যায় তখন আশ্বিন মাসে এই আম পাওয়া যায়। তাই এর নাম আশ্বিনা।

ল্যাংড়া : ১৮ শতকের দিকে এক খোড়া বা ল্যাংড়া ফকির এই আমের চাষ শুরু করে। এই ফকিরের নামে ল্যাংড়া নামকরণ হয়েছে।

সাদুল্লা : এই আম বাজারে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সাদুল্লা গন্ধে ও স্বাদে অনন্য। কোন আঁশ নেই। খুবই মিষ্টি ও সুস্বাদু। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদিয়া, হুগলি জেলায় চাষ হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের রাজশাহি ও চাঁপাই নবাবগঞ্জে সাদুল্লা আমের দেখা মেলে। সাদুল্লা-র অন্যনাম হিমসাগর।

ফজলি: অনেকের মতে ফজলি আমের জন্ম ভারতে। এখনও এই আমের ব্যাপক চাষ হয় মালদহে। মুসলিম গ্রাম্যবধূরা সাধকদের এই আম দিয়ে আপ্যায়ণ করতো। সেইসূত্রে এর নাম ফজলি হয়েছে। অবশ্য অন্য মতও প্রচলিত আছে। এই আম একবার খেয়েছিলেন মালদহের কালেক্টরেট রাজভেনশ সাহেব। স্বাদে মুগ্ধ তিনি। সাহেব এর নাম জানতে চাইলে বধূটি ইংরেজি বুঝতে না পেরে ভাবেন সাহেব বুঝি তার নামই জানতে চাইল। কাজেই আমের নাম না বলে নিজের নাম বললো সে। বউটির নাম ছিল ফজলু বিবি। তা থেকেই ফজলি। ফজলি বিভিন্ন রকমের হয়। এর মধ্যে সুরমা ফজলি অধিক সুস্বাদু।

বউ ভুলানি : এই আম বর্তমান দেখা যায় না। স্বাদে, গন্ধে অতুলনীয়। এর স্বাদ বউয়ের রাগ, অভিমান সব ভুলিয়ে দেয়। তাই বউ ভুলানি।

চিনিচম্পা : কোন কোন নবাবের কাছে সবচেয়ে সুস্বাদু আম। চম্পাবতী ছিলেন নবাব দরবারের বাঈজী। বাঈজীর নামানুসারে চিনিচম্পা নাম।

গোলাপভোগ ও লক্ষ্মণভোগ : মালদহ ইংরেজ বাজারের চণ্ডীপুরের বাসিন্দা লক্ষ্মণ ও নরহাট্টা ছিল প্রখ্যাত আম চাষি। তাদের নামেই আম দুটির পরিচয়।

আম্রপালি : আঞ্চলিক নাম। অন্য মতও রয়েছে। ভারতের বহুল পরিচিত নর্তকীর স্মরণে আম্রপালি নাম রাখা হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। মুর্শিদাবাদে ইদানিং বেশ জায়গা করে নিয়েছে এই আম। তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে মল্লিকাও। দুটোই উচ্চ ফলনশীল। স্বাদও ভালো।

নবাবি আমলে আম ও আমচাষ ছিল শুধুই শখের বিষয়। এখন অবশ্য আম নিছক শখের সামগ্রী নয়। রীতিমতো অর্থকরী ফসল। এক একটি আমবাগান ব্যবসায়িরা ২/৩ বছরের জন্য লিজ নেয়। দাম ওঠে বাগানের পরিমাণ বুঝে। আম পাড়া শেষ হলেই আবার নতুন করে চুক্তি হয়। বড়ো বাগানের দাম ওঠে পাঁচ থেকে আট লক্ষ টাকা পর্যন্ত ।

আম চাষিরা এখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আম চাষ করছে। গাছে মুকুল আসার আগেই গাছে গাছে হরমোন, কীটনাশক ভিটামিন প্রয়োগ করে থাকে। তাতে মুকুল ঝরে যায় না, আমের সাইজ বড় হয় ও আমের গায়ে কোন দাগ ধরে না। এতে ভালো দাম পাওয়া যায়।

লালবাগ সহরের মধ্যে সেরা আমের বাগান হল রাইসবাগ। এখনও বিদ্যমান। এই বাগানে নানা ভালো ভালো জাতের আম আছে। আম সংরক্ষণের জন্য চকবাজারে নবাবদের আম্বাখানা বা আমতারাশ ছিল। এখন আম, আমজনতার বা হাটুরে ফলে পরিণত হয়েছে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

অনেক দিন ধরে বিছানো পরিকল্পনা-জাল গুটিয়ে নেওয়া শুরু হল অবশেষে। এই শুরুর শেষটা কবে কীভাবে হবে তা এখনই ঠিক স্পষ্ট করে হয়তো বলা যাচ্ছে না; তবে উপলব্ধি করা যাচ্ছে মোটের উপর। রাজ্যসভায় যেমন হয়েছে লোকসভাতেও তাই হবে। বিরোধিতার সুর চড়বে সপ্তমে এবং তারপরে যা ঘটার তাই ঘটবে। অর্থাৎ বিলটিকে পাশ করিয়ে নিয়ে যথাসময়ে আইনে পরিণত করা হবে।

এই মুহূর্তে ভারতের যা রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি তাতে অভিন্ন দেওয়ানি আইন বিষয়ে এর থেকে বিপরীত কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সংসদের উভয় কক্ষে তাদের এবং তাদের পিতামহদের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা রয়েছে, যারা বহুদিন এই বিলটিকে সন্তানবৎ লালন লালন করছেন, প্রয়োজন মতো একে ব্যবহার করবেন বাজিমাৎ করার জন্য। এখন সেই সময় এসেছে বলে মনে হচ্ছে। কাজেই এর অন্যথা না হওয়ারই নিকট সম্ভাবনা।

এক দেশ এক আইন; আদর্শগত ভাবে এমন অবস্থান অনভিপ্রেত নয়। সঙ্গত ভাবনা থেকেই আমাদের সংবিধান প্রণেতারা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের কথা ভেবেছিলেন। তাঁদের এই ভাবনার মধ্যে কোথাও কোনো ভুল ছিল না। তাঁরা খুব ভালো করে তাঁদের দেশের নৃতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস এসবের পাঠ নিয়েছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন, এদেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের বিষয়টি মোটেই সুবিধাজনক নয়। তাই তাঁরা কোনোরকম তাড়াহুড়ো করতে চাননি; এমন কি দূর ভবিষ্যতের জন্যও এটাকে বাধ্যতামূলক করার কথা ভাবেননি। কেবল একটা সম্ভাবনার দুয়ার খুলে রাখতে চেয়েছিলেন মাত্র। বলার অপেক্ষা রাখে না, এক্ষেত্রে তাঁদের ভাবনার জগত জুড়ে ছিল বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ। এদিকে এখন আমরা উক্ত সম্ভবনার দুয়ার পথে পরিচালিত করতে চাইছি আমাদের নিজস্ব বা গোষ্ঠিক ইচ্ছার রথকে। আমাদের এমন ইচ্ছার ফলাফল কী হবে তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে এতে করে সম্ভাবনার দিগন্তে যে কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে তা তো দেখাই যাচ্ছে।

ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর সত্তর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এদিনে এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই, যেখানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলিত না থাকায় পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিশেষ সমস্যা হয়েছে। বহু ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, ভাষাভাষির এই বিরাট দেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থাকবে এটাই স্বভাবিক; এই বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সাধনা ভারত-সংস্কৃতির মূল কথা। এখন যদি সংবিধান শিরোধার্য করে ক্ষমতার শিখরে অধিষ্ঠিত হওয়া ব্যক্তিবর্গ দেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে ব্যক্তিক বা গোষ্ঠী স্বার্থে বলি দিতে চান তবে সত্যিই কিছু বলার থাকে না।

বলার থাকে না হয়তো, আবার থাকেও বটে; বিশেষত জনসাধারণের দিক থেকে। জনগণ; তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে যে মানুষগুলিকে ক্ষমতার শিখরে অধিষ্ঠিত করেছেন তাদের অধিকার রয়েছে ওই মানুষগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার; নিজেদের ভালো মন্দকে বুঝে নেওয়ার; প্রয়োজনে হেঁচকা টানে ক্ষমতার উচ্চ আসন থেকে তাদেরকে ভূলুণ্ঠিত করার। কিন্তু আজ জনগণ কি তাদের সেই ভূমিকা পালন করার জায়গায় রয়েছেন? মনে তো হয় না। এই জায়গায় বর্তমান শাসকশক্তি ও তাদের পিতামহরা একটু বেশি রকমের সফল। তারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মনে এমন বিশ্বাসের বীজ উপ্ত করে পারে তাকে ফুলে ফলে পল্লবিত করতে সক্ষম হয়েছেন যে, যাদেরকে জব্দ করার জন্য এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বীণা বাজানো তারা দেশের জন্য সত্যিই বিপজ্জনক, তাদেরকে আচ্ছা করে জব্দ

করা দরকার; আর তা করতে হলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি রূপ অস্ত্র ব্যবহার করা আবশ্যক। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ মুখে কুলুপ আটাকে শ্রেয় বলে জ্ঞান করছেন। যা হচ্ছে তা হতে দাও, এমনটাই তাদের অবস্থান।

তাদের এই অবস্থানের বিপরীতে দাঁড়িয়ে জাতীয় স্বার্থকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে উদ্যোগী হতে পারেন অগ্রসর যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাঁরাও মোটের উপর তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বন্ধন দিয়েছেন ক্ষমতাসীন পক্ষের কাছে। ফলত দুঃসহ যে ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য; বিশেষত যাদেরকে উপলক্ষ্য করে এই উদ্যোগ অর্থাৎ সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের সাপেক্ষে। এক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের দিক থেকে আলাদা করে তেমন কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। তারা এখন একটা কাজই নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পারে বলে মনে হয়; সম্ভাব্য সব রকমের পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা; নিজেদের নিজস্বতাকে বজায় রাখার লক্ষ্যে আপোষহীনপণ করা; তার জন্য প্রয়োজনে প্রেচেষ্টার দিগন্ত বরাবর নিজেদেরকে ছড়িয়ে দেওয়া; বিশেষত বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে।

—সম্পাদক

বুকস স্পেস

২বি/৩, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

দূরভাষ : ৯১৪৩১৩৪৯৯৩ ● e-mail : booksspace2011@gmail.com

সংকলন ও সম্পাদনা : স্বপন বসু

সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ ১০০০/

জহর সেনমজুমদার

হৃল্লেখবীজ ২০০/ **আমার কবিতা** ৩০০/

ভাঙা বাংলা; ভাঙা হ্যারিকেন ১৫০/

ভবচক্র; ভাঙা সন্ধ্যাকালে ১৫০/

সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্ণালী ঘোষ দস্তিদার

সোমবর্ণার গল্প ৩৫০/

সোহারাব হোসেন

বাংলা ছোটগল্পে বাস্তবতাবোধের বিবর্তন ২৭৫/

সংকলক ও সম্পাদনা : রেজওয়ানুল ইসলাম

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ৫০০/

আসিফ জামাল লস্কর

মুসলিম স্পেনের ইতিহাস ২০০/

দীপঙ্কর বিশ্বাস

সাময়িকপত্রে ঔপনিবেশিক বাংলার অর্থনৈতিক চিত্র ৩০০/

বিমলানন্দ শাসমল

স্বামী বিবেকানন্দ ও ইসলাম ধর্ম ১৫০/

সংকলক ও সম্পাদনা : রেজওয়ানুল ইসলাম

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ৫০০/

ড. আব্দুল খায়ের সেখ

'মুসলমানী' পুঁথি সাহিত্য ৪০০/

অমৃতা ঘোষাল

অর্বাচীনের চোখে সুকুমার সেন ৩৫০/

বাংলা সাহিত্যে রসনাবিলাস ৩০০/

সংকলন ও সম্পাদনা : সাইফুল্লা, এ টি এম সাহাদাতুল্লা

দিগ্‌দর্শন ২৫০/ **সমাচার দর্পণ** ২৫০/

সম্পাদনা : কাজী মাসুদা খাতুন, রবিউল আলম

একুশ শতকের বাংলা উপন্যাস : অন্বেষণ বীক্ষণ ৪০০/

হাবিবা রহমান

শাহাদাৎ হোসেন : কবি-কথাকার-নাটককার ৬৫০/

সাইরা খাতুন

প্রতিভা বসুর ছোটোগল্প ১৫০/

সাক্ষাৎকার : মীরাতুন নাহার

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : পত্রিকার পক্ষে ইনাস উদ্দীন

** আপনার ব্যক্তিজীবন–পারিবারিক জীবন–ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠা নিয়ে কিছু বলুন।

* মেয়েদের পারিবারিক জীবনের দুটি অঙ্গ। এক. জন্মসূত্রে পাওয়া পারিবারিক জীবন এবং দুই. বিবাহসূত্রে পাওয়া পারিবারিক জীবন। মেয়ে হিসেবে আমার এই দুই জীবনেই অর্থানুকূল্য এবং শিক্ষিত পরিবেশ দুটোই মিলেছে। এই দুটির অভাব প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে বহু জীবনে– অর্থাভাব ও আত্ম-জনেদের মধ্যে শিক্ষার অভাব। আমাকে কোনটির সাথেই মোকাবিলা করতে হয়নি। আমি সেদিক থেকে সৌভাগ্যবতী। ছোটো বয়স থেকে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে জন্মসূত্রে উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত মেধা ও দৃঢ়চিত্ততা আমার জীবনে কোনো বাধাকেই বাধা হয়ে উঠতে দেয়নি। আমার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে গ্রামে। সেই গ্রামজীবনে সকল স্তরের মানুষের কাছ থেকে মেধার যে প্রকার স্বীকৃতি মিলেছে তা বিস্ময়কর। সেই সঙ্গে উগ্রতাবিহীন শান্ত স্বভাবের উচ্চ প্রশংসাও যুক্ত হয়েছিল– সে সত্য মানতেই হবে।

বিবাহসূত্রে পাওয়া পারিবারিক জীবনে একমাত্র সঙ্গী পেয়েছি পেশায় সরকারি উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার এবং আক্ষরিক অর্থে শিল্পী মনের ও নেশার (সরোদ) মানুষকে। সম্পূর্ণত বাস্তববোধহীন। ফলে সংসারের জোয়াল কাঁধে নিতে হয়েছে এবং সংসার-জীবনকে বইতে হয়েছে আমাকেই। সেই ভার দুঃসহ মনে হলেও সাধারণ মানুষদের সহযোগিতা ও ভালবাসা পেয়ে বইতে সক্ষম হয়েছি। এই জীবনে আরেকটি সদস্য হয়েছে– সেটি আমার আত্মজা। অতিশয় মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন 'স্বাধীন' মানবী হয়ে উঠেছে জীবনে সে। পেশায় অধ্যাপক। নেশা ছবি আঁকা ও পিয়ানো শেখা।

বলা আবশ্যক যে, আমার নিজস্ব পরিবারটি ছোটো কিন্তু বস্তুত আমার জীবনের পরিমণ্ডল অনেকখানি বিস্তৃত এবং আমি বৃহৎ পরিবার নিয়েই বাঁচি। পরিবার-সদস্যদের নিয়েই কেবল বাঁচা তেমন জীবন আমার গড়ে ওঠেনি। এই প্রকার জীবন-যাপনেই আমার জীবন বাঁচার অর্থ খুঁজে পেয়েছে, এটি বাস্তব সত্য।

** শিক্ষাজীবন– স্কুল-কলেজের কথা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা-সহপাঠীদের কথা বলুন।

* প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছি উত্তর ২৪ পরগনার গুড়দহ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছি বাদুড়িয়া দিলীপকুমার মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশন এ। তারপর নবম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে উচ্চ মাধ্যমিক (তৎকালীন) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই বসিরহাট হরিমোহন গার্লস স্কুল থেকে ১৯৬৬ সালে, প্রথম বিভাগে (হিউম্যানিটিজ)। কলকাতা লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি. এ. অনার্স এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থকে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করে (প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় স্থান) ইউ. জি. সি. ফেলোশিপ পেয়ে দুবছর গবেষণা করার পর অধ্যাপনা পদে অকস্মাৎ নিযুক্ত হওয়ার জন্য গবেষণাকর্ম ছাড়তে হয়। এরপর চাকরিসূত্রে বেশ কিছু বছর পর ইউ জি. সি' টিচার ফেলোশিপ পাই এবং ছুটি পেয়ে গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করি।

পুরো স্কুলজীবনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা ও আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য আমার জীবন। কলেজ জীবনে এতো বেশি শহুরেপনা দেখেছি যে, ভালো লাগেনি সেই জীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সব ক্ষোভ মিটে গিয়েছিল বিদ্যার্জনের যথার্থ পরিবেশ ও অধ্যাপকদের পূর্ণ সহযোগিতা-ভালোবাসা পেয়ে। এই শিক্ষালয়ে দর্শন শিখেছি এবং জীবনে সেই শিক্ষা প্রয়োগ করতে পেরেছি এযাবৎকাল পর্যন্ত। ব্রিটিশ আমলের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট

আমার আব্বা, এই প্রতিষ্ঠান ছাড়ার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আমি সুবিখ্যাত আইয়ুব দম্পত্তির পরামর্শে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমি কৃতজ্ঞ এই দুই মনীষীর কাছে, তাঁরা আমার জীবনে সঠিক দিশা দেখিয়েছিলেন বলে– গৌরী আইয়ুব ও আবু সয়ীদ আইয়ুব।

শিক্ষালাভের প্রতিটি স্তরেই সহপাঠীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল– কেবল কলেজ-জীবন ব্যতিক্রম। উল্লেখযোগ্য যে, প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছেলে-সহপাঠীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অতি স্বাভাবিক হতে পেরেছিল। তবে বাদুড়িয়া স্কুলে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের কথা বলাবলি, মেলা-মেশা একেবারে মানা ছিল। আমার ভালো মনে হয়নি সেই সম্পর্ক। অবশ্য সেই সময়টি ছিল মফস্‌সলে এমন যে, মেয়েদের স্কুলে পড়াশোনা নামক ব্যাপারটি টেনে টুনে ক্লাস এইট-নাইন পর্যন্ত ঘটতে পারত! মুসলমান মেয়েদের দেখাই মিলত না! ১৯৬০ সালের চিত্র এমনটি ছিল। তবে উল্লেখযোগ্য যে, বাদুড়িয়া স্কুলের যে সহপাঠী (ছেলে)-রা স্কুল-জীবনে কথাই বলতে পায়নি তাদের মধ্যে বেশ কজন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে সময়ে তাদের সঙ্গে আমার সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠে–মৃগাঙ্ক, কপিলানন্দ, বিষ্ণুপদ, রঞ্জন, গোপাল.....। অন্য দিকে ভিন্ন চিত্র হল আমার প্রাথমিক স্কুলের সহপাঠী বিশ্বনাথ মেধাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও অসহ্য অর্থাভাবের কারণে পড়াশুনা ছেড়ে সাইকেলের দোকানের কর্মচারী হতে বাধ্য হয়। সেই নিষ্ঠুর বাস্তবতা আজও আমাকে কষ্ট দেয়। সে-ও আমার ভালো বন্ধু হয়েছিল স্কুলে!

** আপনার বিষয় দর্শন। এই নির্বাচনের নেপথ্যে কি কোনো বৃত্তান্ত আছে, না নিছকই ভালোলাগার সূত্রে এ পথে পা রাখা?

* বড়ো ভাই আমাকে নিরন্তর বলে গেছে– আমাকে প্রফেসর হতে হবে এবং দর্শনশাস্ত্রের। আব্বা নিজে ও তাঁর মাতৃ-পরিবার (তাঁর মা সহ) এবং আমার মাতৃ-পরিবার শিক্ষিত হওয়ার ফলে বিষয় নির্বাচনের একটা পটভূমিকা প্রস্তুত তো হয়েই ছিল। ছাত্রী হিসেবে আমার তর্কবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান পাঠে অধিক আগ্রহ জন্মেছিল। শিশুবয়স থেকে বই পড়াতে অনুরাগ জন্মেছিল সমধিক। সেই নেশাই বিষয়গুলির সাথে পরিচিতি ঘটিয়ে দেয়। বাদুড়িয়ার স্কুলটিতে এই বিষয়গুলি পড়ানো হতো না বলে আমি বসিরহাটের স্কুলে ভর্তি হই– বাড়ি থেকে মাটির রাস্তায় মিনিট পনেরোর পথ হেঁটে বাসে এক ঘণ্টা পথ পাড়ি দিয়ে তিনবছর ধরে পড়েছি সেই স্কুলে, বিষয় দুটিকে ভালো লাগার টানে। বিশেষত লজিক আমাকে আকৃষ্ট করেছিল এবং সেই সঙ্গে মনকে বোঝার বিষয়টিও।

** অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন?

* কলকাতার নামী কলেজ– ভিক্টোরিয়া কলেজ। ১৯৭৫ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত এই কলেজে অধ্যাপনা করে অবসর গ্রহণ করি। পড়াতে খুব ভালো লাগত। প্রতিদান পেয়েছি অপ্রত্যাশিত। অজস্র, অকৃত্রিম ভালবাসা মিলেছে ছাত্রী (গার্লস কলেজ)-দের তরফ থেকে। সেই বন্ধন ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বরাবর দূরে ঠেলে রেখেছি। তৃপ্তিতে ভরে থেকেছে মন। ক্ষোভ মনের কোথাও বাসা বাঁধতে পারেনি। রাজনৈতিক দলীয়তার আবিলতা পেশাজীবনের শেষদিকে কলেজ-অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার পেলেও আমার জীবনে সেসব বাধা হয়নি। দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা ও ঋজুতা– এই তিনটি গুণের সমন্বয় ঘটাতে পারলে জীবনকে সর্বপ্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত রাখা যায়– এই বিশ্বাস আমি অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা থেকেই লাভ করেছি। কর্তৃপক্ষ, শিক্ষার্থী ও সহকর্মী– কোনো পক্ষই আমার অধ্যাপনা নামক পেশাজীবনে সাফল্য লাভ করার পথে বাধা হয়ে উঠতে পারেনি, বরং আমাকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বর্ষণ করে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করেছে।

** এখন আপনি অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু আপনার কর্মরথ আরও দ্রুতগতিতে ধাবমান। এই বিপুল শারীরিক ও মানসিক শক্তি কীভাবে অর্জন করছেন?

* শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করার মূলে রয়েছেন আমার মা। তিনি আব্বার কর্মস্থল কলকাতায় ১৯৪৬ সালে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতা মেনে নিতে না পেরে দাদা-শ্বশুরের গ্রামে গিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে পুষ্টিকর খাবার-দাবার সন্তানদের দেবেন বলে খাদ্য-শস্য উৎপাদন, ফুলের বাগান তৈরি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। ফলস্বরূপ আমরা তিন ভাইবোন (আমি ও আমার দুই বড়ো ভাই) তাঁর ব্যবস্থাপনায় সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি পেয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হই। আমার বর্তমান শারীরিক সুস্থতা বা শক্তি তারই ফলশ্রুতি।

মানসিক শক্তি-ও তাঁরই কাছ থেকে পেয়েছি। তাঁর মতো সাহসী ও দৃঢ় মানসিকতা সম্পন্ন মানবী খুব কমই দেখা যায়!

** এখন আপনি আমাদের কাছে সোস্যাল অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে রোল মডেল। কোন্ পথে, কীভাবে এই অর্জন?

* আমি মনে করি, মিডিয়া আমাকে এখন 'সমাজ কর্মী' বানিয়ে দিয়েছে। আমি নিজেকে তেমনটি ভাবি না। যা বলি, যা লিখি বা যা করি– স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেগুলি সম্ভব হয়। মানুষ হিসেবে মানুষের কথা ভেবেই সবকিছু করে চলেছি। বিশেষ কোনো পরিকল্পনা অবলম্বন করে এই 'অর্জন' সম্ভব হয়েছে তেমনটি নয়।

এর আগে মিডিয়া আমাকে 'শিক্ষাবিদ' পরিচয় দিয়েছে বহুদিন ধরে। সে পরিচয়ের কিছুটা ভিত্তি থাকলেও প্রকৃত অর্থে আমাকে শিক্ষাবিদ বলা যায় না। তেমনি সমাজকর্মীও নই। আজ মিডিয়ার যুগ। মিডিয়া যা বলে তাই সকলে মানে। আমি সে দলভুক্ত নই। তাই নিজেকে কোনো কিছুরই 'রোল মডেল' বলে ভাবতেও দ্বিধাবোধ করি! এইপ্রকার 'অর্জন' কীভাবে সম্ভব হল?– প্রশ্নের উত্তর সেকারণেই আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

** আপনার ভালোলাগার, কাজ করার অন্যতম বিষয়-রোকেয়া। রোকেয়া সম্পর্কে আপনার বীক্ষণ তুলে ধরুন।

* বছর দশেক বয়সে পারিবারিক সংগ্রহে থাকা শামসুন নাহারের লেখা 'রোকেয়া জীবনী' পড়ে অভিভূত হয়ে যাই। তখনই বুঝে ফেলেছিলাম, কী অসম্ভব তিনি জীবনে সম্ভব করেছিলেন! মনে মনে সংকল্প গ্রহণ করি– তাঁকে নিয়ে কিছু করা একান্ত আবশ্যক এবং তার জন্য তাঁর রচনাদি পড়তে হবে। আমার শৈশবে খোঁজ করে পাইনি। নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পড়েছি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'রোকেয়া রচনাবলী'। তারপর এই বঙ্গে তাঁকে নিয়ে চর্চা শুরু করা সম্ভব হল তারও বহু বছর পরে।

দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে বোঝার চেষ্টায় যে সত্য অনুভবে পেয়েছি কটি কথায় বলা যাক– ১. তিনি সামগ্রিকভাবে দেশীয় সমাজব্যবস্থায় লিঙ্গ-বিভাজন কী ভয়াবহ ক্ষতি সাধন করেছে তা নিজে বুঝে দেশবাসীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন নিজ রচনাদি ও কাজকর্মের মাধ্যমে। ২. স্বদেশকে গভীরভাবে ভালোবেসে তার পরাধীনতা-মুক্তির জন্য সাধ্যাতীত প্রয়াস গ্রহণ করতে পিছ পা হননি। তিনি পরাধীনতার দুটি প্রধান কারণ নির্ণয় করেছিলেন– হিন্দু-মুসলমান বিভেদ এবং মেয়ে ও পুরুষের মধ্যে মানুষ হিসেবে সামর্থ্যের ফারাক তৈরি করে রাখা নামক অজ্ঞতা। ৩. মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত দেশবাসীদের মধ্যে যে অচলায়তন সেকালে গড়ে উঠেছিল সেটিকে তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় নড়াতে চেয়েছিলেন। মেয়েদের শিক্ষা বিনা সম্প্রদায়ের উন্নয়ন যে সম্ভব নয় সে সত্য তিনি একক প্রচেষ্টায় মেয়েদের চেতনায় সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন, যেটি আজও আমাদের স্বদেশবাসী মেয়েরা বুঝে উঠতে পারেনি–বিয়ে মেয়েদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। কোনো সমাজের মেয়েদের বোধে এই ভাবনা আজও সেভাবে ঠাঁই করে নিতে পারেনি। অথচ রোকেয়া দেশ-কাল-ভাবনারীতি—এসেবর গণ্ডী পেরিয়ে জীবনের এই মোক্ষম সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁকে আমার তাই বিস্ময়-মানবী বলে মনে হয়।

**) এই বাংলায় রোকেয়া চর্চায় আপনি পথিকৃৎ। আপনার প্রতিষ্ঠিত সুরাহা সম্প্রীতির কথা আমরা জানি। সুরাহা সম্প্রীতির কথা, সুরাহা সম্প্রীতির সূত্রে রোকেয়াচর্চা নিয়ে কিছু বলুন।

*) 'সুরাহা-সম্প্রীতি' নামক সংস্থাটি রোকেয়াচর্চার জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৯০ সালে। কয়েকটি নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় প্রতি বছর সেগুলি সম্পন্ন করার জন্য—রোকেয়া স্মারক বক্তৃতা, রোকেয়া পুরস্কার ও রোকেয়া বৃত্তি। প্রথম দুটি বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উপস্থাপন করা হত। তৃতীয়টি প্রতি মাসে দেওয়া হত অর্থাভাবগ্রস্ত মেধাবী নির্দিষ্ট কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের। বক্তৃতা বিস্মৃতপ্রায় মনীষীদের অবদান বিষয়ক এবং পুরস্কার বহু বাধা পেরিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন মেয়েদের দেওয়া হত। যেমন, সবজি বিক্রি করে হিউম্যানিটি হাসপাতাল করে পরে পরিচিতি লাভ করেছিলেন যিনি সেই সুবাসিনী মিস্ত্রিকে 'রোকেয়া পুরস্কার' দেওয়া হয়েছিল তাঁর এমন কর্মকাণ্ডের শুরুতেই। রোকেয়া বৃত্তি পেয়ে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করে জীবনে বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে। প্রথম রোকেয়া স্মারক বক্তৃতা দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যিনি রোকেয়া বিষয়ে গবেষণা করে প্রথম পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন—সামসুল আলম। বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলিতে যাঁদের উপস্থিতি মিলেছিল সভাপতি হিসাবে তাঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়, শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত, হাসান আজিজুল হক, অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম প্রভৃতি নাম সমধিক পরিচিত।

রোকেয়া এবং অন্যান্য বিস্মৃতদের জীবন ও রচনাদিকে ভিত্তি করে রচিত আলেখ্য ও নাটক ইত্যাদি বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হত। সুরাহা সম্প্রীতির সূচনাকালে বেশ কিছুজন এগিয়ে আসেন। তারপর তারা তাদের নিজ নিজ অথবা গোষ্ঠীগত আকাঙ্ক্ষাদি পূরণ হবে না বুঝে একে একে, একত্রেও সংস্থা ত্যাগ করে। 'সুরাহা-সম্প্রীতি' নামটিও ক'জনের বিশেষ অনুরোধে রাখা হয় রোকেয়ার নাম যুক্ত না করেও কাজ করার সম্ভাবনা ও পরিসর বাড়বে এমন যুক্তি দেখিয়ে। তারপরেও তারা সংস্থা ত্যাগ করে। সংস্থা সক্রিয় থাকে আঠারো বছর ধরে। শেষ দিকের কয়েকটি বছর রোকেয়ার লেখা বই প্রকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। বলা আবশ্যক যে, বিশ্বকোষ পরিষদের কর্ণধার পার্থ সেনগুপ্ত এই সংস্থা থেকে রোকেয়াকে জেনে-বুঝে তাঁর রচনাবলি প্রকাশের জন্য সুগভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ২০০১ সালে 'রোকেয়া রচনা সংগ্রহ' এই বঙ্গে প্রথম তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। তাঁর ইচ্ছেকে মান্যতা দিয়ে অতিশয় আনন্দিত চিত্তে মানস জানা ও আখের আলি সর্দার নামক দুই তরুণের সাহায্য নিয়ে রোকেয়ার রচনাগুলি সংগ্রহ ও যাচাই করে নিয়ে সম্পাদনার কাজটি সম্পন্ন করতে সমর্থ হই।

এই সংস্থা গঠনকালে সর্বজনশ্রদ্ধেয়া গৌরী আইয়ুবকে সভানেত্রী হওয়ার অনুরোধ জানালে অসামান্যা এই মানবী বলে ওঠেন– 'আবার আমাকে কেন? তোমরাই করো কাজটি! এক কাজ করো– মিসেস কাদিরকে নাও।' তাঁকে ছাড়িনি। তাঁর ইচ্ছেকে অমান্য না করে কিশওয়ার জাহান (মিসেস কাদির) মহাশয়াকে সহ-সভানেত্রী করা হয়। তিনি সুশিক্ষিতা সমাজকর্মী এবং অতিশয় সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত মহিলা। গৌরীদির প্রয়াণের পর তিনিই সভানেত্রী হন। তিনি বরাবর পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রেখেছিলেন এই সংস্থার শেষ সক্রিয় কার্যক্রম চলার সময় পর্যন্ত। 'সুরাহা-সম্প্রীতি' ধীরে ধীরে কাজ কমিয়ে আনতে আনতে এখন বন্ধ হয়ে গেছে। তার দুটি প্রধান কারণ হলো– ১. এ-বঙ্গে রোকেয়া চর্চার প্রসার ঘটে গেছে অনেকটাই, কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না হলেও। ২. সংস্থার সক্রিয় চালকদের ক্রমবর্ধমান নানা ধরণের কর্মব্যস্ততা। এতদসত্ত্বেও 'সুরাহা-সম্প্রীতি' একটি সফল সংস্থা, কেননা, এই বঙ্গে আজ ধীরে হলেও রোকেয়া-চর্চা নজর কাড়ছে। তবে ক্ষোভের বিষয় হলো, কেবল চর্চা বা স্মরণকর্ম দ্বারা তাঁর মতো মহৎপ্রাণাকে অনুসরণ করা সম্ভব নয় এবং সেটি ঘটছেও না। 'আমি বা আমরাই করছি বা করেছি'– ভাবটি এতো প্রকট হয়ে ওঠে যে, মাঝে মাঝে সুগভীর লজ্জা পেতে হয় এমন আচরণে! সেকারণে, 'পথিকৃৎ' পরিচয় গ্রহণে অকৃত্রিম দ্বিধা বোধ করেছি। পথিকৃৎ হওয়া কী সহজ কথা!

** রোকেয়ার পাশাপাশি আপনার অন্যতম ভালোলাগার ক্ষেত্র নজরুল। আপনার সম্পাদিত নজরুল বিষয়ক পত্রিকা দোলন চাঁপা আমাদের মধ্যে অন্য প্রত্যয় সঞ্চার করেছে। নজরুল ও দোলন চাঁপা সম্পর্কিত আপনার ভাবনা তুলে ধরুন।

* কাজী নজরুল ইসলাম আমার কাছে 'চির উন্নত শির'... মানুষ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন এমন একজন মানুষ এবং তিনি সেটাকেই 'মানুষ' হয়ে ওঠার অন্যতম লক্ষণ বলে গণ্য করে নিজেকেও সেভাবে গড়েছিলেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব রূপে। তাঁর মতো প্রতিভাধর মানুষ বিরল। তবু তাঁর এই 'চির উন্নত শির' উচ্চারণ আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে এবং দেয় অনুক্ষণ, তাঁর বহু ধারায় প্রবাহিত ও প্রকাশিত বিস্ময়কর সৃজনশীল সত্তার প্রতি মুগ্ধতা সত্ত্বেও।

'দোলন চাঁপা'-র আগে এস. ইউ. সি. আই. নামক রাজনৈতিক সংগঠনের এক প্রতিনিধি আমার কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসেন তাঁদের নজরুল সংস্কৃতি পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'নজরুল সংস্কৃতি পরিষদ পত্রিকা' তাঁরা বের করতে চান নিয়মিত। সম্পাদনার কাজটি আমাকে করতে হবে–স্বাধীনভাবেই। বাকি দায়ভার ওঁরাই বহন করবেন। সম্মত হই নজরুল-ভক্ত হিসেবে এবং টানা দশ বছর ধরে সম্পাদনার কাজটি করবার পর ছেড়ে দিই। বুঝতে পারি, পত্রিকাটি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বাইরে যেতে পারছে না। স্থির করি, নিজেই নজরুলকে নিয়ে একটি পত্রিকা করবো এবং নাম দিই কবিরই একটি কাব্যগ্রন্থের নামে– 'দোলন চাঁপা'। ভেবে নিয়েছিলাম, পত্রিকার নিবন্ধগুলি নজরুলের এক একটি নির্দিষ্ট গ্রন্থ বিষয়ক হবে। তেমনটি করা হলো। পরে আরও দুটি বিভাগ যুক্ত করা হয়– লোক-সৃষ্টি এবং শিশু-কিশোর বিভাগ। সাধারণ মানুষের সৃজন-প্রতিভা এবং সেইসঙ্গে শিশু-কিশোরদের নিজেদের রচনা প্রকাশ করা হয় এই দুটি অংশে। প্রথম থেকেই একজন বিদ্বান মানুষের সহায়তা পেয়েছি যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে। শ্রীযুক্ত নির্মল

সাহা– একজন খাঁটি নজরুল-অনুরাগী ব্যক্তিত্ব। আর শিক্ষিকা সাহানা পারভীন শিশু-কিশোরদের রচনা সংগ্রহ করে দিয়ে প্রভূত সহায়তা দিয়ে চলেছে। নয় বছর পার করেছে দোলন চাঁপা সুধীজনদের সদিচ্ছা নিয়ে।

** একটা সময় জিজ্ঞাসা পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন; এখনও সংযোগ রয়েছে বলে জানি । জিজ্ঞাসার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন।

* 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকা এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত গোষ্ঠী (র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশন)-র কর্ণধার ছিলেন শিবনারায়ণ রায়। তিনি ছিলেন বাঙালি কূলে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। এই সত্য নিজ অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনে-বুঝে ঘটনাচক্রে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। একটি লেখার প্রস্তাব পেয়ে ব্যক্তিগত আলাপে অসম্মতি প্রকাশ করেছি সরাসরি তাঁর কাছেই। তারপর প্রকাশ্য সভায় বহু গুনী-জ্ঞানী ব্যক্তিদের মাঝে তাঁর সমালোচনা করেছি। তিনি এমন সব আচরণে ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ না হয়ে আমার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়েছেন বুঝে আমি তাঁর কাছে হার মেনেছি। বিরূপ মনোভাব সরে গেছে মনের আকাশ থেকে। লেখা চেয়েছেন আবার। দিয়েছি সানন্দে। 'জিজ্ঞাসা'-র নজরুল সংখ্যা প্রকাশ করবেন ঠিক করে আমাকে অতিথি সম্পাদক হওয়ার দায়িত্ব দিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, সেই সংখ্যাটি সম্প্রতি বইরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এরপর তিনি স্থির করলেন, জিজ্ঞাসার নতুন সম্পাদনা গোষ্ঠী তৈরি করে দিয়ে নিজে নিষ্কৃতি লাভ করবেন বয়স হয়েছে বলে। এই গোষ্ঠীতে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করলেন। আমি অসম্মত হইনি। চলছিল পত্রিকা সেভাবেই, তিনি প্রয়াত হলেন। আমার কিছু অসুবিধা দেখা দিল। সম্পাদনার দায়িত্ব ছাড়লাম। এখন যাঁরা দায়িত্বে আছেন তাঁরা লেখা চাইলে দিই। এইটুকু মাত্র। সম্পর্ক রয়ে গেছে। এখন এই পত্রিকা চালানোর দায়িত্ব যার স্কন্ধে প্রধানত ন্যস্ত হয়েছে তার নাম কানাই পাল—দক্ষ প্রকাশক এবং শিবনারায়ণ রায়ের দীর্ঘ দিনের নিষ্ঠাবান এবং সহায়ক কর্মী। বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্বরাজ সেনগুপ্ত বহুদিন ধরে এই সংস্থার সদস্য এবং জিজ্ঞাসার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তিনি বার্ধক্য ও অসুস্থতা জনিত কারণে এখন সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। কানাই পাল আমার কটি বই এর প্রকাশক। তাঁদের আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে আমন্ত্রিত হই নিয়মিত এবং সাড়া দিই। এই সংস্থার আর একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব অম্লান দত্তের স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েও আমি আপ্লুত বোধ করেছি। মূলত এঁদের জন্যই সংযোগটুকু আজও ছিন্ন হতে পারেনি।

** এখন আপনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেন। একটা সময়ে এস ইউ সি আই দলের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কেন প্রত্যক্ষ রাজনীতির অঙ্গনে পা রেখেছিলেন, কেনই বা সরে এলেন?

* প্রত্যক্ষ রাজনীতি বা পরোক্ষ রাজনীতি কোনটিতেই কখনও যোগ দিইনি। তাই সরে আসার প্রশ্নটিই অবান্তর। 'রাজনীতি' করার অর্থ আমি যা বুঝি তা হল, দেশোন্নয়ন ও দেশগঠনমূলক কাজের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করা। কাজটি ভালো লাগা বা ভালোবাসার কারণে এবং যোগ্যতা থাকলে তবেই করা সম্ভব। বস্তুত সেটি সুকঠিন কাজ। এমন কাজের প্রতি আকর্ষণ হয়নি কখনও, আর সে সক্ষমতাও আমার নেই। আত্মশক্তি সম্যক বুঝেই যেসব কাজ পারি সেগুলিই করেছি আমি এতদিন ধরে। নজরুল সম্পর্কিত পত্রিকা সম্পাদনার সূত্রে এস. ইউ. সি. আই, নামক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটে। সেকথা আগেই বলেছি। সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি এবং কমিটিতে যুক্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে। তেমন সম্পর্ক এখনও আছে কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক কাজকর্মে আমি কোনোদিনই যুক্ত হইনি। এই দলটিই সেকথা ভালোভাবে জানে ও আমাকে বোঝে।

** এখন বাংলার তথা ভারতীয় রাজনীতিতে মূল্যবোধহীনতার নগ্ন রূপ সুপরিস্ফুট। কীভাবে দেখছেন ও নিচ্ছেন বিষয়টিকে?

* ভোগবাদিতা-আকীর্ণ ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় 'রাজনীতি' যেমনটি হওয়ার তেমনটি হয়েছে বা হচ্ছে। 'রাজনীতি' এখন দেশ ও দেশবাসীকে ভুলে 'করে-কম্মে' খেয়ে দেশ-সম্পদ লুঠপাঠ করার নীতি—যেটিতে মূল্যবোধ নেহাতই বেমানান বিষয়। তাই সেক্ষেত্রে মূল্যবোধহীনতাই বরং মূলধন-স্বরূপ এবং সহায়-সম্বল বলে গণ্য হয়েছে, লক্ষ করা যাচ্ছে।

** বর্তমানে রাজ্যে ক্ষমতাসীন রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে ইচ্ছা করছে।

* একনেত্রী-নির্ভর একটি দল পশ্চিমবঙ্গে শাসক দল হিসেবে ক্ষমতাসীন হয়ে কেবল দল-সমৃদ্ধি ঘটানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে যাবতীয় গণতান্ত্রিক দায়-দায়িত্ব ভুলে সে কাজটিকেই একমাত্র কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছে এবং সে কারণে গণতান্ত্রিক সরকার গড়তে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। গণতন্ত্রের মর্যাদা ভুলে আধিপত্যকামী সি. পি. এম-সর্বস্ব বামদলের দীর্ঘ জমানার অবসান ঘটিয়ে জন-গণ যা চেয়েছিলেন তার কিছুমাত্র ঘটাতে পারেনি। বর্তমান অপ-রাজনীতির পূজক শাসকদল। জনগণ চেয়েছিলেন তাদের দৈনন্দিন সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান। পরিবর্তে শাসকদল তাদের লোভাতুর, ভয়কাতর, সমাজ-বিরোধী রাজ্যবাসী বানিয়ে ফেলেছে। যে মহা-মূল্যবান সতর্কবাণীকে এই দল দলিত-মথিত করে চলেছে সেটি হলো— চালাকির দ্বারা কখনও মহৎকার্য সিদ্ধ হয় না! ফলস্বরূপ, রাজ্যের জন-গন আজ দুর্ভাগা দুলভুক্ত রাজ্যবাসীতে পরিণত হয়েছে।

** মেয়েদের স্বাধিকার নিয়ে এখন নানা কথা হচ্ছে। প্রাধান্য পাচ্ছে ফেমিনিজমের ধারণা। কীভাবে দেখছেন বিষয়টিকে?

* আমি নারীবাদী নই। মানবতাবাদী মনে করি নিজেকে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সত্য বুঝেছি যে, সমগ্র বিশ্ব জুড়েই মেয়েরা মানবাধিকার লাভে বঞ্চিত থেকেছে বহুকাল ধরে। আমাদের দেশে সেই পরিস্থিতি মর্মান্তিক রূপলাভ করেছে এবং এখনও তার অবসান ঘটেনি। যথার্থ সত্য হলো, দুটি পুরুষের মধ্যে বা দুজন মেয়ের মধ্যে নানা-ধরনের ভিন্নত্ব থাকে। যেমন, একজন মেয়ে ও একজন পুরুষের মধ্যে তেমনই বিবিধ রকমের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দু-পক্ষই তারা—সমান মানুষ। মানুষ হিসাবে কোনো ভিন্নত্ব নেই তাদের মধ্যে। তাই উভয়েই তারা সমান মানবাধিকার ভোগ করার অধিকারী। সেখানে 'ক্ষমতা' খেলা করেছে নিষ্ঠুরভাবে। ক্ষমতা কোনোক্রমে আয়ত্ত করে নিয়ে পুরুষ-শ্রেণি মেয়ে-শ্রেণিকে বঞ্চিত করে রাখার নিষ্ঠুর কৌশল ব্যবহার করেছে এবং করছে। ক্রমে ক্রমে মেয়েরা জেগেছে। মাথা তুলেছে। আর তারা অসহায়ভাবে মার খাবে না। এমনটিই আমার বিশ্বাস। আমার জীবনই আমার বিশ্বাসের পক্ষে তথ্য উপস্থাপন করে এবং আমার পশ্চাৎ-শক্তি ছিলেন আমার মা— একজন আত্মপ্রত্যয়ী মানবী, 'কেবল মেয়ে' নয়। তেমন জীবনই যাপন করছে আমার উত্তরসূরী অধ্যাপক-কন্যাও।

** পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ নানা সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। মুসলমান সমাজের একজন হিসাবে বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন এবং কোন পথে এর সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে বলে মনে করছেন।

* পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ প্রধান দুটি কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে— এক. দেশভাগ বা বঙ্গবিভাজন এবং দুই. রাজ্যবাসী হিসেবে এই সমাজভুক্ত মানুষজনেরা ধর্মীয় বিশ্বাসের নিরিখে 'সংখ্যালঘু' বলে চিহ্নিত হয় সর্বক্ষেত্রে এবং সেকারণে বঞ্চনার শিকারও হয়ে পড়ে নানাভাবে। দেশভাগের পর যারা এ-বঙ্গে থেকে যান তারা অধিকাংশই পশ্চাৎপদ অবস্থানে থাকা মুসলমান জনগণ। তাদের সর্বপ্রকার দুরবস্থা ঘটেছে সে সময়ে। নিজের সমাজে কেউ হাত ধরার ছিল না। আবার 'সংখ্যালঘু' শ্রেণিভুক্ত হওয়ার ফলে তাদের 'সংখ্যাগুরু'দের অবহেলার শিকারও হতে হয়েছে অনিবার্যভাবে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বঞ্চিত অথবা অ-বঞ্চিত উভয় শ্রেণিভুক্ত অ-মুসলমান মানুষ-জনের চোখে তারা বিধর্মী শত্রু বলেই গণ্য হয়েছ অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ফলস্বরূপ তারা 'নানা সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে' পড়ে এবং সে অবস্থার অবসান আজও ঘটেনি।

এই সমস্যার সমাধানে তিনটি প্রধান উপায়ের কথা মনে করতে পারি— ১. স্ব-সমাজের মানুষ-জন যারা এগিয়ে আছেন বা এগিয়ে যেতে পেরেছেন তারা নিজের সমাজের পিছিয়ে পড়াদের দিকে সামর্থ্য মতো যেন হাত বাড়িয়ে দেন-সহযোগিতার। ২. মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জাগরণ-মন্ত্রে মুসলমান পুরুষরা যেন নিজেদের দীক্ষিত করেন! অন্যথায় সমগ্র সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব! সমাজের অর্ধেক সদস্য দ্বারা সমাজ-উন্নয়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়! এই সত্য ভুলে থাকলে পিছিয়ে পড়ে থাকাই 'নিয়তি' হয়ে পড়বে। ৩. এই বঙ্গের 'সংখ্যাগুরু' সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙালিরা যেন মনে রাখেন যে, রাজ্যের একটি জনগোষ্ঠী (সংখ্যায় তারা তুলনায় লঘু হলেও) পিছিয়ে থাকলে গোটা রাজ্য এগোতে পারে না। তাই তাদের কর্তব্য হলো, 'সংখ্যালঘু'দের হাত ধরে এগোতে সাহায্য

করা এবং তাদের মুসলমান পরিচয়কে অধিক গুরুত্ব না দিয়ে নিজ রাজ্যবাসী বলে মান্যতা দেওয়া।

** কেউ কেউ মনে করেন পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সমাজের দুরবস্থার মূলে রয়েছে সাতচল্লিশের দেশভাগ। দেশভাগ না হলে অবস্থা এত সঙ্গীন হত না। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

* সাতচল্লিশে দেশভাগ ঘটানো হয়েছিল মূলত দুটি কারণে– ১. ব্রিটিশ শাসকদের দুরভিসন্ধি। তারা সহজে ভারত ছেড়ে যেতে চায়নি। চিরকালের জন্য একটা ক্ষত সৃষ্টি করে যেতে চেয়েছিল ভারতের বুকে। ২. ভারত-নেতৃবর্গ ভেবেছিলেন, হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ প্রশমিত হবে দেশটা দু-টুকরো হলে– ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি দেশে বিভক্ত হলে।

আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয়, ব্রিটিশদের ক্রূর মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে দেশভাগের ফলে। কিন্তু অন্য দিকে ভারত-ভাগ মেনে নেওয়া ভারতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ জেনে অথবা না জেনে প্রকাণ্ড একটি ভুল করেছিলেন। দেশভাগ হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ নামক সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান ঘটাতে পারেনি। উল্টে দু-টুকরো হওয়া দেশের দুটি অঙ্গেই এই বিরোধকে চিরস্থায়ী করে ফেলা হয়েছে। তার প্রমাণ মিলেছে পরবর্তী বহু ঘটনায়। 'বাংলাদেশ'-এর অভ্যুদয় না ঘটলে এই সমস্যা ঘোরতর রূপ নিত যে, সে সম্পর্কে সংশয় থাকার কথা নয়। তাই আমি মনে করি, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের যাবতীয় দুর্দশার অন্যতম কারণ– দেশভাগ এবং দেশভাগ-ই। সেই সঙ্গে যে কথাটি বলার সেটি হলো, দেশভাগ না হলে কী ঘটত সেকথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব না হলেও, ঘটে যাওয়া এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি যে এবঙ্গে আমাদের দেখতে হতো না সেকথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

একটি প্রশ্ন তুলেই আমার এই মন্তব্যের বিপক্ষে যারা তাদের সংশয় দূর করার চেষ্টা করা যেতে পারে : দেশ-ভাগ ঘটিয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের জটিলতা কিছুমাত্র দূর করা গেছে কী?

** দেশভাগ ও এই সূত্রে পূর্ববঙ্গে মুসলমান সমাজের যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসার তা কীভাবে দেখছেন?

* আমি বিষয়টিকে এভাবে দেখতে পারি না। আমার মনে হয় না যে, দেশভাগ না হলে 'বাঙালি মুসলমান সমাজের এমন উন্নতি' সম্ভব হতো না। বরং আমার মনে হয়, হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে সমগ্র বাঙালি সমাজের খণ্ডিত রূপের উন্নয়ন আমাদের দেখতে হলো এবং একই সঙ্গে সমগ্র বাঙালি মুসলমানদের খণ্ডিত উন্নয়ন ঘটলো মাত্র, পশ্চিমবঙ্গবাসী মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার মূল্য দিয়ে! আমার এই অনুভবের সত্যতা 'বাংলাদেশ'-এর উদ্ভব নামক বাস্তবতা দিয়ে বোঝা যায় বলেই আমি মনে করি।

হিন্দু বা মুসলমান পরিচয় অপেক্ষা বাঙালি পরিচয়ের পরিসর নিঃসন্দেহে ব্যাপক আর সেটাই প্রমাণিত হয়েছে পাকিস্তান ভেঙে দু'টুকরো হওয়ার ঘটনায়। ধর্ম-বিভাজনের ভিত্তিতে ভারত-ভাগ যে ভুল সিদ্ধান্ত ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে এই বাস্তব ঘটনাটি ঘটে যাওয়াতে– এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইতিহাস নিজস্ব নিয়মে এভাবেই মানুষকে উচিত শিক্ষা দিয়ে চলেছে বারবার।

একটা কথা বলি ভাববার জন্য– ভারত নামক ভূখণ্ডে আজ বাঙালি অখণ্ডতার আবশ্যকতা কী এখনও বোধের অতীত হয়ে থাকবে? ধর্ম-বিশ্বাসই জাতির ঊর্ধ্বে ঠাঁই নিয়ে থাকবে এখনও?

** মুসলমান সমাজের একটা অংশ আপনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন, আপনাকে নিয়ে গর্ব করেন। আবার কেউ কেউ রয়েছে যারা আপনার প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট নয়। কীভাবে নিচ্ছেন তাদের এই সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিকে?

* সেটাই তো স্বাভাবিক! সকলকে সন্তুষ্ট করা বা সকলের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা অর্জন করা একই মানুষের পক্ষে কী সম্ভব? বিশেষত আমার মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে তো তা নেহাতই অসম্ভব! তবে যেটুকু আমার পক্ষ থেকে বলার কথা সেটি হলো, জীবনের নিয়মে চলতে গিয়ে যা করণীয় মনে হয়েছে সাধ্যমতো করেছি, যা লিখতে পেরেছি লিখে গেছি, বলার কথা নিজস্ব ধরনে বলে গেছি– জীবনের গতিময়তাকে মেনে থামেনি আমার সেসব কাজকর্ম-লেখালেখি ইত্যাদি। কোনো পক্ষের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কোনো কাজ কখনও করিনি। আমার কথায় বা কাজে কেউ অসন্তুষ্ট বোধ করতেই পারেন তবে সেটিও আমার অভিসন্ধিমূলক নয় বা কাউকে আহত করাও আমার লক্ষ্য হয়নি কখনও। ন্যায় ও সত্যকে মান্যতা দিয়ে যা করার, বলার, লেখার– করে গেছি সেসব।

ব্যক্তি-মানুষকে খুশি করা বা আঘাত দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কোনো কিছুই করিনি জীবনে– এটুকুই কেবল বলতে পারি।

** ইসলাম ধর্ম ও নবী মুহম্মদ (সঃ) সম্পর্কে আপনার নিজস্ব বীক্ষণ তুলে ধরুন।

* ইসলাম ধর্ম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠবয়সী বলে মানব জীবনের প্রায় সকল বিষয়ে সংস্কারমূলক উদার জীবন-দর্শনকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। সেগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে নিজেদের যারা প্রবল ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসী বলে মনে করেন তারা বিশেষ অবহিত নন বা তেমন সচেতনও নন বলে মনে হয়। নিজ ধর্মকে ভালোবেসেই শান্তির ধর্মকে বরং তারা হিংসামূলক বৃত্তি জাগানোর কাজেও ব্যবহার করেন, দেখা যায়। ইসলাম অথচ মানুষকে যথার্থ মানুষ হতে প্ররোচিত করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, ইসলাম ধর্মাবলম্বী কেবল 'মুসলমান' হতে চায়। মানুষ হওয়ার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলেও তাদের সেক্ষেত্রে চেতনা জাগতে চায় না। সেখানেই দুঃখবোধ করি, মনে মনে। ইসলাম ধর্মের যথার্থ স্বরূপ অনুধাবনে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই ব্যর্থ হয়েছেন– এমনটি লক্ষ করা যায়।

বিশ্বস্রষ্টা আল্লার প্রেরিত দূত হজরত মুহম্মদের জীবনচর্যা যে কোনো মানুষের জন্য অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য। তাঁর দেখানো পথে সেভাবে চলতে পারেনি তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের সমর্থকরা। তাই তো কবি নজরুল তাদের সকলের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন নবীর কাছে–

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ
ক্ষমা করো হজরত।

** উগ্র সাম্প্রদায়িক বিষয়াদি নতুন করে আচ্ছন্ন করছে আমাদের মন ও মননকে। এর পরিণতি কী হতে পারে বলে মনে করছেন?

* সাম্প্রদায়িকতা হল এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আরেক সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তোলা নামক একটি অতি নিন্দনীয় অমানবিক প্রক্রিয়া। সম্প্রদায় হল এক্ষেত্রে ধর্ম-সম্প্রদায়। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা হলো একই দেশবাসী বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ জনকে কেবল ভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসী হওয়ার জন্য ঘৃণিত বলে গণ্য করতে দেশবাসীকে প্ররোচিত করা ও তাদের উৎখাত করার পরিকল্পনাকে নিজ ধর্মের প্রতি গভীর ভালোবাসার লক্ষণ বলে গণ্য করতে উৎসাহ দেওয়া নামক কর্ম-পদ্ধতি। এই প্রকার কর্ম-পদ্ধতি যখন কোনো দেশে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায় এবং সেই রাজনীতিকে কোনো দেশ-পরিচালক গোষ্ঠীর হাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় তার থেকে মর্মান্তিক আর কিছু হতে পারে না।

গভীর উদ্বেগ ও দুঃখের বিষয় হলো, বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সংস্কৃতির সমন্বয় ক্ষেত্র মহান ভারতকে 'হিন্দু ভারত' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সর্ববিধ প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে বর্তমান সময়কালে আমাদের দেশে, সাম্প্রদায়িকতাকে বাহন বানিয়ে। এই প্রয়াস, এক কথায় বলি, বিশ্বজনীন মানবাধিকার সনদ বিরোধী এবং আমাদের নিজেদের দেশের বিশ্ব-নন্দিত সংবিধান ধ্বংস সাধনকারী প্রচেষ্টা। এর পরিণতি? অখণ্ড ভারত ধর্ম-বিভেদ দূর করার জন্য খণ্ডিত হয়ে কী সুফল মিলেছে? পাকিস্তান এক ধর্মবিশ্বাসীর দেশ হিসেবে টিকে থাকতে পেরেছে অখণ্ড রূপে? বিশ্বের এক ধর্মবিশ্বাসী মানুষের দেশগুলোতে হিংসার কারণে রক্তাক্ততা, হানাহানি—এসব দূর করা গেছে? উত্তরগুলো সকলের জানা এবং তার থেকেই উগ্র সাম্প্রদায়িকতা অথবা নিজ ধর্মভক্তির উগ্রতা যে পরিণতি এনে দেয় বা দেবে তাও সকলের অনুমেয়।

বস্তুত এসব বিষয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করলেই সব কথা বলা হয়ে যায় এবং সেটি হল—মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা ও হিংসার উদ্রেক করা নামক কর্মপদ্ধতি কী কোনো প্রকৃত ধার্মিক মানুষ বা গোষ্ঠীর পক্ষে আদৌ সম্ভব? অতএব ধর্মভক্তি প্রদর্শন আসলে ভাণ এবং মূল লক্ষ্য হল সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি। আমাদের ঐকান্তিক কামনা হোক—দেশবাসীর 'মন ও মননকে' এই সংকীর্ণতা যেন ভর করতে না পারে।

** সামাজিক ক্রিয়াকর্মের পাশাপাশি আপনার কলম সক্রিয় রয়েছে প্রথমাবধি। আপনার লেখালিখির কথা বলুন।

* কলম হাতে নিলে লেখাটি সহজে চলে আসে—বিষয় ভিত্তিক হলেও। এটি যতদূর বুঝি, উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। আমার মায়ের আব্বা, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী (১৯১৭), সরকারি চাকরীজীবী, অতিশয় বিদ্বান, এবং সুলেখক ছিলেন। দেশভাগের পর চাকরিতে অপশন পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে থাকেন অসবরগ্রহণের আগে পর্যন্ত। তাঁর রচনাদি সেকারণে আমরা বড়ো হয়ে প্রকাশিত রূপে এ-বঙ্গে পাইনি। পাণ্ডুলিপি কিছু আমি পেয়েছি। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই লেখা। তাঁর থেকেই লেখক সত্তা পেয়েছি।

আমাকে লেখক হয়ে উঠতে সহায়তা দিয়েছে লিটল ম্যাগাজিনগুলো। আমার লেখার চাহিদা এখনও আমাকে মানে আমার কলমকে সচল রেখেছে নিত্যদিন। বস্তুত অবসর পাই না প্রতিদিনের জীবনে পরিমিত, এই লেখালেখির জন্যই। বিস্তারিত বলা নিষ্প্রয়োজন। কেবল এটুকু বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক– লেখা প্রকাশের বা প্রচারের জন্য কাঙালপনা আমার মধ্যে নেই এবং সৌভাগ্যবশত আমাকে তা করতেও হয়নি।

** উত্তর প্রজন্মকে মোটিভেট করার জন্য কী বলবেন?

* প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভালো আমি ও মন্দ আমি-র দ্বন্দ্ব চলে সর্বক্ষণ। ভালো আমি ভালোবাসা, ক্ষমা, মমতা, দয়া প্রভৃতি দ্বারা এবং মন্দ আমি হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি বৃত্তি দ্বারা চালিত হয়। প্রতিটি মানুষের অবশ্যকর্তব্য হলো, মন্দ আমি-কে ভালো আমি-র নিয়ন্ত্রণে রেখে দ্বন্দ্ব দূর করে দেওয়া। তাহলেই জীবনে সার্থকতা মিলবে। কাজটি সহজ না হলেও অসম্ভব নয়।

* কোনো দায়বদ্ধতা নয়, একান্তভাবে ভালো লাগে, তাই করেন; এমন কিছু বিষয়ের কথা বলুন।

* মানুষকে কোনোভাবে সহায়তা দিতে পারলে খুব ভালো লাগে আর খুব গুছিয়ে সব কিছু করতে পারলে আমার ভালো লাগে। অগোছালো থাকতে পারি না এক মুহূর্তের জন্যেও। অতিশয় ক্লান্ত অবস্থাতেও এলোমেলো ব্যাপারগুলিকে সুবিন্যস্ত করে নিতে পারলে তবেই ভালো লাগায় ভরে মন। আর নিবিড় ভালোলাগার বিষয় হলো– বই পড়া ও গান শোনা।

** জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে সম্পন্ন করার মতো বিশেষ কোন কাজ কি নির্ধারণ করে রেখেছেন?

* দুটি বিশেষ বই লিখে যেতে চাই আর– একটি উপন্যাস এবং অপরটি আত্মকথা। এ ছাড়া নিজ গ্রামে আব্বা-মার নামে মেয়েদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবামূলক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে যেতে চাই। কিন্তু মন বলছে– হাতে আর সময় নেই! আমার কন্যার উপর কাজটি তাই সম্পন্ন করার দায়-ভার দিয়ে রেখেছি।

** জীবনের উপান্ত বেলায় এসে উপনীত হয়েছেন। এই অবস্থায় প্রাপ্তির আনন্দ ও অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা কতটা অনুভব করেন?

* অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা দিয়ে প্রাপ্তির মধুরতাকে এতোটুকু কম করে দেখি না। এ জীবনে পেয়েছি আমি প্রচুর– বহুদিক থেকে। যেটুকু পাইনি তার যন্ত্রণা দুঃসহ। তবে সেই না পাওয়া আমার অফুরন্ত পাওয়ার আনন্দের উপর থাবা ফেলতে পারেনি। সেই অনুভবকে কখনও মাথা তুলতে দিইনি। বৌদ্ধ দর্শন আমাকে শিখিয়েছে– সুখ না পাওয়া পর্যন্ত দুঃখ (না পাওয়ার দুঃখ), পাওয়ার পর হারাই হারাই ভয়ে দুঃখ আর সুখ চিরস্থায়ী হয় না বলে চলে গেলে দুঃখ পাই আমরা– মানুষ। অতএব এই দুনিয়ায়-দুঃখই একমাত্র সত্য।

আমি তো এই সত্য মানি বলেই অনুভব করি– আমার মতো প্রাপ্তি ক'জনের জীবনে ঘটে! আমি ধন্য!

** আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ থেকে শুরু করে আরও যেসব কাজ করছে ও করার পরিকল্পনা করেছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত প্রত্যাশা করি।

* অবিভক্ত বাংলায় কলকাতার কেন্দ্রে যেসব সৃজনশীল, প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব বেশ কিছু উঁচু মানের পত্রিকা ও সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন এবং বাঙালি মুসলমান সমাজের সাহিত্য ও সংস্কৃতি মহলে আলোর বন্যা বইয়েছিলেন, দেশ-ভাগের ফলে তাঁরা প্রায় সকলেই পূর্ব-পারের বাসিন্দা ছিলেন বলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই ধারা এই বঙ্গে। আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ সেই প্রবাহ আবার ফিরিয়ে আনার সাহসী প্রয়াস গ্রহণ করেছে। অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য পদক্ষেপ।

এই সদ্যোজাত সংস্থার দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করি। আমাকে দিয়ে এত কথা বলিয়ে নেওয়াও এই সংসদের সক্রিয় কর্ম-প্রচেষ্টার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আমাকে অনেকখানি সময় দিতে হলো আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের প্রধান ব্যক্তিত্ব এবং সংসদের সাহিত্য পত্রিকা 'উজ্জীবন'-এর সম্পাদক অধ্যাপক সাইফুল্লার দৃঢ় মানসিকতা ও উদ্যোগ গ্রহণের নিষ্ঠাকে মান্যতা দিয়ে। আমার পক্ষ থেকে সংসদ-সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করি।

প্রয়াণ-কথা

চলে গেলেন খবরের কাগজওয়ালা জয়নাল আবেদিন

একজন মানুষ কাকভোরে উঠে লেগে পড়তেন প্রভাতী সংবাদপত্র ফেরি করতে। তারপর একটু বেলা হলে দেখা যেত, তিনি পাউরুটি, বিস্কুট, কেক প্রভৃতি নিয়ে দোকানে দোকানে পৌঁছে যাচ্ছেন। এমনি সব কাজ করে দিনান্তে যা প্রাপ্তিযোগ হত তার আশ্রয়ে সচল থাকত তার সংসারের চাকা। এসব সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়।

নদীয়া জেলার চাপতা অঞ্চলের বানিয়া খড়ি গ্রামের ভূমিপুত্র জয়নাল আবেদিন কাগজ বা পাউরুটিওয়ালার কাজকে মেনে নেননি তাঁর অনিবার্য ভবিতব্য রূপে। বরং নিয়তির বিপরীতে প্রবলভাবে খড়্গহস্ত ছিলেন তিনি; তাই সবসময় সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝোলানো ব্যাগে রেখে দিতেন একটি খাতা। যখনি কবিতার ঢেউ আছড়ে পড়তো তাঁর চেতন মনে তখনি থেমে যেত চলমান সাইকেল; রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবিতা রচনা করতেন কবি জয়নাল আবেদিন।

কোনো সন্দেহ নেই, কবি জয়নাল আবেদিন এক বিস্ময়কর উদ্ভাসনের অন্য নাম। তাঁকে সাদরে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁর সময়ের বাণিজ্যিক, অবাণিজ্যিক প্রায় সমস্ত পত্রিকা। দেশ পত্রিকার পৃষ্ঠাতে কমবেশি শতবার মুদ্রিত হয়েছেন তিনি। এক একটা সময়ে প্রথম শ্রেণির প্রায় সমস্ত পত্রিকায় একযোগে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতা।

কী লিখতেন; কোন গুণে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন বাঘা বাঘা সব সম্পাদক। কথার জাল না বিস্তার করে বরং পা রাখা যাক তাঁর কবিতার অঙ্গনে—'সময় ঝুঁকে পড়েছে আলোর দিকে/কেউ দেখছে না শুধু জলপ্রপাতের শব্দ/শুনে শুনে পেরিয়ে যাচ্ছে নদী'(ফেরা);'ভাবছি ভাবছি আর ভাবছি/ছায়াকে আর বয়ে বেড়াবো না আমি/তাঁকে ছেঁটে ফেলে দিলে ভার কিছুটা অবশ্যই কমবে।' (ভার); 'আজ ভরে ভোরের শরীরকে নাচতে দেখে/মনে হল খালি পেটেই বিষ খেয়েছে সে/বমি করে তুলে দিচ্ছে বিষ আর বাতাসকে সঙ্গে/নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে।' (কাঁটাতার)

কবিতার দেশের মানুষ আমরা; কবিতার হাতে হাত রেখে আমাদের ছোটো থেকে বড়ো হওয়া। তবু তারপরেও চেতন মনের চরাচর জুড়ে যেন ঝড় ওঠে কবি জয়নাল আবেদিনের এইসব উচ্চারণের সূত্রে। মনে হয়, সত্যিই তো এসব কথা এমনি করে এর আগে কখনো বলা হয়নি।

কবি জয়নাল আবেদিন (১৯৫৯-২০২২) তাঁর পাঠককে প্রতিষ্ঠিত করেন অসামান্য এক প্রত্যয়ের ভিত্তিভূমিতে। একটা সময় ছিল যখন আধুনিক কবিতা পড়ার জন্য পাঠককে সন্তরণ করতে হতো দেশ বিদেশের পুরাণ, ইতিহাস এবং বহুবিধ ভাষার অভিধান রূপ সমুদ্রে। রীতিমতো ভয়াবহ ব্যাপার। এখন অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি সেভাবে। অনুভূতির পবিত্রতা ও উচ্চারণের অনন্যতায় পাঠককে আবিষ্ট করার কৌশল প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন আজকের কবি-সম্প্রদায়। তাঁরা বরং পাঠককে চমকে দিয়ে বাজিমাৎ করাতে অধিক উৎসাহ বোধ করেন। বলা বহুল্য এই পথে কোনো সত্য কবিতার জন্ম হতে পারে না এবং হচ্ছেও না। এতে যত দিন যাচ্চে বাংলা কবিতা ততই তার কৌলীণ্য হারাচ্ছে। অবশিষ্ট ভাষার কবিতা পাঠক এখন আর বাংলা কবিতার দিকে তাকিয়ে থাকে না সেভাবে; আমরা আর তাদেরকে তেমন ভাবে পরিতৃপ্ত করতে পারি না। আমাদের এই সর্বাত্মক ব্যর্থতার বিপরীতে যা কিছু সম্ভাবনাময় উচ্চারণ রয়েছে সেখানে অনায়াসে স্থান করে নেয় জয়নাল আবেদিনের 'মেঘ দিলাম, বৃষ্টি নামিয়ে নিও', 'অন্তর্গত বাঁশি' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ।

তাঁর কবিতার এমন একটা রঙ আছে, রূপ আছে যাকে ধারণ করার জন্য পণ্ডিত হওয়ার দরকার হয় না। শুদ্ধ অনুভূতির দীপ জ্বেলে কবিতার সমীপে প্রণত হলেই চলে।

এমন প্রবল সম্ভাবনাময় যে কবি তিনি ঝরে গেলেন প্রায় অনাদরে, অবহেলায়। প্রিয়জনদের বদান্যতায় মফস্সল থেকে তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতার বই প্রকাশিত হলেও তিলোত্তমা কলকাতা তাঁকে আপন করে নেয়নি সেভাবে। এখন দেখার কবিতা সমগ্র; নিদেনপক্ষে নির্বাচিত কবিতা প্রকাশ করে আমরা তাঁর অতৃপ্ত বিদেহী আত্মাকে তৃপ্ত করতে পারি কি না।

—আবদুল করিম

সম্পাদক এবাদুল হক ও 'আবার আসিব ফিরে'

'আবার আসিব ফিরে'-র দর্পণে প্রতিবিম্বিত হননি এমন সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব আমাদের মধ্যে বেশি নেই। উদীয়মান বা সম্ভাবনাময় সাহিত্যিকদের অবাধ চারণভূমি ছিল এই ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে। অতঃপর এর চলার পথ সম্প্রসারিত হয়েছে এইসময় পর্যন্ত। শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে মার্চ ২০২১। অর্থাৎ ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে বেশ একটু ছন্দপতন লক্ষ করা গেছে এবং এই ছন্দপতনেরও বিশেষ কারণ রয়েছে। আসলে এরই মধ্যে জীবনযুদ্ধে পরাভূত হয়েছেন সম্পাদক এবাদুল হক। তাঁর অকাল প্রয়াণের প্রেক্ষিতে ঘোরতর প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি হয়েছে পত্রিকাটি। উত্তরসূরীদের কণ্ঠে কখনো কখনো প্রতিধ্বনিত হয়েছে প্রত্যয়ী সুর। কিন্তু বাস্তবায়ন সেভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে না। প্রাজ্ঞ সমাজ অবগত আছেন, এই না যাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এমন অনেক মানব সন্তান রয়েছে যারা হয়তো জন্মক্ষণে মাকে হারিয়েও জীবনযুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটা হয়নি। সম্পাদকের প্রয়াণ-পথ অনুসরণ করে পথচলা সমাপ্ত হয়েছে অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার। আবার আসিব ফিরে-র ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি তাই হয় তাতেও অবশ্য কিছু এসে যায় না। একটি সাহিত্য পত্রিকা স্থায়ী হয়েছে প্রায় অর্ধ শতাব্দী। এর থেকে গৌরবের আর কী হতে পারে! এমন অসংখ্য সংবাদ-সাময়িকী রয়েছে দুই চারটি সংখ্যাতেই থেমে গেছে তার পথচলা। সেদিক থেকে কয়েক দশককে প্লাবিত করে প্রবাহিত হওয়া আবার আসিব ফিরে-র অসামান্যত্ব অনস্বীকার্য।

একটি ছোটোপত্রিককে স্থায়ীত্ব দেওয়ার নেপথ্যে কী বিপুল পরিমাণ আত্মত্যাগ থাকে অনেক সময় সাধারণে তা সেভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না। আমরা জানি এক্ষেত্রে সম্পাদক এবাদুল হক এর অবস্থান ছিল তারও অনেক ঊর্ধ্বে। পেশায় শিক্ষক সম্পাদক মহাশয় প্রথমাবধি তাঁর বেতনের একটা অংশ বরাদ্দ করে রেখেছিলেন আবার আসিব ফিরে-র জন্য। আমরা যেমন করে আমাদের সন্তান-সন্ততি বা পরিবারের জন্য নিজেকে নিঃশেষে নিংড়ে দিই তাঁর পত্রিকার জন্য তিনি সেটাই করেছিলেন। অন্তরঙ্গ অন্বেষণে প্রতিপন্ন হয়েছে, এক অর্থে স্ত্রী, পুত্রদের থেকেও অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল আবার আসিব ফিরে, তার সম্পাদক-পিতার কাছ থেকে। এমন হলে পারিবারিক বিড়ম্বনা সীমা ছাড়ানো স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে তা হয়নি; এ বড়ো সৌভাগ্যের কথা।

পরপর দুই বার গুরুতর পথ দুর্ঘটনার স্বীকার হন সম্পাদক মহাশয়। প্রাণে বেঁচে যান বটে; কিন্তু স্বাভাবিক চলৎশক্তি নষ্ট হয়ে যায় সম্পূর্ণভাবে। এমন দুঃসহ দুর্বিপাকের মধ্যেও আবার আসিব ফিরে-র বহমানতা অব্যাহত ছিল। বোঝা যায় পত্রিকাটির জন্য কতখানি আন্তরিক ছিলেন সম্পাদক।

নামেই ছোটোপত্রিকা। আবার আসিব ফিরে কিন্তু আকারে আয়তনে মোটেই ছোটো ছিল না। তিনশোর নিচেয় পৃষ্ঠা সংখ্যা নামেনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে। বিপুল আকারের এই পত্রিকার দাম ছিল তুলনায় নগণ্য। সবচেয়ে বিস্ময়ের এই সামান্য দামও দামমাত্র ছিল। লেখক গোষ্ঠী তো বটেই সাধারণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বও প্রায়শ ডাকযোগে বাড়িতে বসে পেয়ে যেতেন আবার আসিব ফিরে; কেউ কেউ তো নিয়মিতভাবে, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে; উপঢৌকন স্বরূপ।

আমরা এখনো ভেবে পাই না কীভাবে এমন অসাধ্য সাধন করেছিলেন সম্পাদক মহাশয়। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, শেষের দিকে পত্রিকার কাজ করতে গ্রামের বাড়ি থেকে গাড়ি ভাড়া করে বহরমপুরে আসতেন; প্রেসে কম্পিউটারের সামনে বসে থাকতে অত্যন্ত কষ্ট হত, তবু শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সংশোধন করতেন নিজের চোখে। অসুস্থ শরীর বহন করতে পারেনি এই ভার; একসময়ে তা ভেঙে পড়ে; হয়তো বা শরীর তার পক্ষ থেকে মধুরতম প্রতিশোধ নেয়।

এখন প্রশ্ন, নিজেকে এমনি করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে গেছেন যে মানুষটি তাঁকে প্রদীপ্ত রাখার জন্য আমরা কী করেছি বা করার পরিকল্পনা নিয়েছি।

—নাফিসা ইয়াসমীন

পড়ে পাওয়া : চোদ্দোআনা নয় ষোলোআনাই

দৈনিক পুবের কলম পত্রিকায় ধারাবারিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এই সময়ের অন্যতম বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জাহিরুল হাসান-এর 'পড়ে পাওয়া : চোদ্দোআনা নয় ষোলোআনাই'। অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়েছে ১২টি কলাম। কলামগুলির মূল উপজীব্য বই ও তার রূপকার সম্প্রদায় অর্থাৎ লেখক শ্রেণি। এ এক অনন্য উপস্থাপন। ইতিপূর্বে বাংলার পত্র-পত্রিকায় এমন কোনো কলাম এর মুদ্রিত রূপ প্রত্যক্ষ করা গেছে বলে মনে পড়ছে না। পরিকল্পনা অভিনব। বই এর কথা, লেখকের কথা, লেখক ও তাঁর সময়ের ছান্দিক স্পন্দন এসব তো রয়েছেই; সঙ্গে অত্যাবশ্যক উপাদান রূপে মিশে রয়েছে কলামিস্ট এর নিজস্ব বীক্ষণ ও উদ্ভূত রচনাশৈলী। প্রবন্ধ বা নিবন্ধ, যদি এমন কোনো মোটা দাগে দেগে দেওয়া হয় এই রচনাকে তবে অব্যশই সুবিচার করা হবে না। প্রবন্ধের মননশীলতা ও রচনাসাহিত্যের প্রসাদগুণের অদ্বিতীয় সহাবস্থান ঘটেছে এখানে। এ রচনা কেবল বস্তুগত সত্যের উত্তাপে তপ্ত করে না পাঠককে; আরও কোনো পবিত্রতার উৎসার ঘটে এর গভীর থেকে।

প্রকাশিত ১২টি পর্বের কোথাও সেই অর্থে কোনো পুনরাবৃত্তি নেই। বৈচিত্র্য বজায় রাখার লক্ষ্যে লেখকের চেতন মনের ক্রিয়াশীলতা এখানে সুস্পষ্ট। এমনিতে এর যা ধরন তাতে বিষয়টি মামুলি পুস্তক সমালোচনায় পরিণত হতে পারতো। এমন মহতি বিনষ্টি থেকে আপন সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য সম্ভাবনার দিগন্ত বরাবর নিজেকে বিছিয়ে দিয়েছেন লেখক জাহিরুল হাসান। তিনি এখানে অবলীলায় জায়গা করে দিয়েছেন সেইসব সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে যারা সেই অর্থে লেখক নন। বিশ্বকোষ পরিষদের কর্ণধার পার্থ সেনগুপ্ত যেমন। পার্থ সেনগুপ্তের ব্যক্তিত্ব ও মননের বর্ণাঢ্য রূপ তাঁর সময়ের সচেতন মন মাত্রকে আলাদা করে আকৃষ্ট করেছিল। লেখকও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর এই অব্যতিক্রমী অবস্থানের হার্দিক উপস্থাপনে রঞ্জিত হয়েছে চোদ্দোআনা নয় ষোলোআনাই-এর একটি পর্বের কলেবর।

এক্ষেত্রে বৈষয়বৈচিত্র্য ও রচনাশৈলীর নিজস্বতাকে আরও স্পষ্ট করার জন্য দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে সদ্য প্রকাশিত ১২তম পর্বের গভীরে। সূচনাতেই রয়েছে পাঠক প্রতিক্রিয়ার কথা, সেইসূত্রে পাঠকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান—'প্রত্যেক পাঠকের কাছে আমার অনুরোধ, কোনো ভুল চোখে পড়লে ধরিয়ে দেবেন, প্রাসঙ্গিক কোনো তথ্য যোগ করতে চাইলে জানাবেন, তা ছাড়া একটু যদি তর্ক হয়ও এতে বিষয়টা আরও খুলবে।' অতঃপর এসেছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য রচিত 'মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা', রুহুল আমিন মণ্ডল এর 'জগৎগুরু শঙ্করাচার্য' শীর্ষক রচনা সহ আরও সব বই এর কথা। ঠিক স্পষ্ট করে বলা না হলেও প্রত্যেক পর্বেই প্রতিভাত হয়েছে এক একটি থিম। আলোচ্য পর্বে যেমন সম্প্রীতি চেতনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সম্প্রীতি চেতনার কথা বলা হবে আর ভাই গিরিশচন্দ্রের কথা আসবে না, তাই কি হয়। অনিবার্যভাবে এসেছে গিরিশ সেন প্রসঙ্গ। সম্প্রীতি চেতনার শানে আরও একটু ধার তোলার জন্য উচ্চারিত হয়েছে অতিরিক্ত চারজনের নাম, যারা বাংলায় আল কুরআন এর আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন।

এখন আমরা এমন একটা সময়কে অতিক্রম করছি, যার তুল্য দৃষ্টান্ত বিশেষ নেই। সব দিক থেকে কেমন যেন দমবন্ধ অবস্থা তৈরি হয়েছে। এমন অবস্থায় আশু আবশ্যক হয়ে উঠেছে এক মুঠো শুদ্ধ বাতাসের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ। প্রিয় পাঠক, 'পড়ে পাওয়া চোদ্দোআনা নয় ষোলোআনাই' আপনাকে উপহার দেবে সেই স্পর্শ। বলা বাহুল্য, এমন উপহারের বহর যত সম্প্রসারিত হয় ততই মঙ্গল।

—মামুদ হোসেন

বহরমপুরে শিশু বইমেলা

বহরমপুরে মহারানী কাশীশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ৬ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'সূর্যসেনা পরিবার' আয়োজিত শিশু বইমেলা।

ভারতবর্ষে প্রথম এবং সারা বিশ্বের হিসেবে চতুর্থ এই শিশু বইমেলা এ বছর ৩০ তম বর্ষে পা দিল। ১৯৯২ সালে শুরু হয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর আয়োজিত হয়ে চলেছে, বিগত করোনাকালে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও বাদ পড়েনি। এটা বিরল দৃষ্টান্ত। শিশুদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি এবং মানবিক চেতনা গড়ে তুলতে হবে, এই অঙ্গীকার নিয়ে মাস্টারদা সূর্যসেনের আদর্শকে সামনে রেখে বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী শ্রীনির্মল সরকার ১৯৯২ সালে গড়ে তোলেন সূর্যসেনা পরিবার। মূল্যবোধের ভোগবাদী অবক্ষয় রোধ করতে হলে শিশুদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে সুস্থ সংস্কৃতি চেতনা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মানবিকতা বোধ। স্থানীয় জে এন একাডেমি স্কুলের শিক্ষকতা থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে নির্মলবাবু পুরোপুরি নিজেকে এই লক্ষ্যে নিয়োজিত করেন।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি বইয়ের স্টল খোলেন যেখানে শিশু-কিশোরদের উপযোগী সুস্থ রুচি ও সংস্কৃতি সম্পন্ন বই পুস্তক পাওয়া যাবে। 'সূর্য সেনা' নামে শিশু-কিশোরদের উপযোগী ও রচনা সম্বলিত একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ শুরুতে করেন। যার ধারাবাহিকতা এখনও বজায় আছে। শিশু কিশোররাই মূলত তাঁর এই কর্মকাণ্ডের সৈনিক, সংগঠনের কর্মী। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় বহরমপুরের ব্যারাক স্কোয়ারে গড়ে তুলেছেন 'সূর্য সেনা ভবন'। সেখানে একটি পাঠাগার রয়েছে; চলছে নিয়মিত সাংস্কৃতিক চর্চা এবং দুঃস্থ শিশুদেরদের লেখাপড়া শেখানোর প্রয়াস।

৩০তম বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সূর্যসেনার সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অদিতি কুমার ধাওয়া, প্রবীণ সংগীত শিল্পী অমৃত গুপ্ত, চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. উৎপল সিংহ, প্রাবন্ধিক ইনাস উদ্দীন, বিশিষ্ট সমাজসেবী শেখর দত্ত, মিলন মালাকার, সাংবাদিক মুজিবর রহমান, গবেষক প্রকাশ দাস বিশ্বাস প্রমুখ। এবারের বইমেলার থিম ছিল সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' কাব্যগ্রন্থের শতবর্ষ। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশুদের নানারকম শরীর চর্চা এবং যোগব্যায়ামের প্রদর্শন হয়। এছাড়া প্রতিদিনই ছিল ছোটদের উপযোগী বিভিন্ন রকমের প্রতিযোগিতা—যেমন গান, আবৃত্তি, নাচ, বিতর্ক, ক্যুইজ, হাতের কাজ, তাৎক্ষণিক ছড়া লেখা, গল্প লেখা, প্রবন্ধ রচনা, যেমন খুশি সাজো, শ্রুতি লিখন প্রভৃতির সাথে এক অভিনব বিষয়—পোস্টকার্ডে চিঠি লেখা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছয় দিনে প্রায় ১৪০০ প্রতিযোগী এইসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য বিষয় হল, যে পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিদিনের মঞ্চ সঞ্চালনার কাজগুলিও ছোটরাই সম্পন্ন করেছে।

বাচ্চাদের সাথে প্রতিদিনই এসেছেন তাদের অভিভাবকেরা। বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা, নেড়েচেড়ে দেখার পাশাপাশি প্রায় লক্ষাধিক টাকার বই বিক্রি হয়েছে। বইপত্রের সঙ্গে পরিবেশ প্রেমীদের পক্ষ থেকে ছয়দিন ধরে বিনামূল্যে নানাবিধ গাছের চারা বিলি করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই শিশু বইমেলা অবশ্যই একটি আশা জাগানোর মতো ঘটনা।

চাতক সাহিত্য সম্মেলন ২০২২

চাতক ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'সাহিত্য সম্মেলন ও চাতক পুরস্কার ২০২২' উপলক্ষ্যে একটি মননশীল ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো গত ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২ ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদের লালবাগে সিংঘী উচ্চতর

বিদ্যালয়ে। দুই দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে এপার-বাংলা ওপার-বাংলা থেকে বহু গুণীজনের সমাবেশ ঘটে। সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট জনেরা নানা বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ আলোচনা করেন। কথাসাহিত্য, কবিতা, শিক্ষার প্রসার, সমাজসেবা, সাংবাদিকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সংবর্ধনা ও চাতক পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং 'উজ্জীবন' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ড. সাইফুল্লাহ শামীম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক আবুল কালাম আজাদ। কবি আব্দুর রফিক খানের পৌরোহিত্যে এইদিন মুর্শিদাবাদের লিটল ম্যাগাজিন, সাহিত্যচর্চা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন ইতিহাসবিদ খাজিম আহমেদ, ড.আসরফি খাতুন, কুনাল কান্তি দে, তায়েদুল ইসলাম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং ইসলামপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. মুজিবুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট উদ্যোগপতি রামকৃষ্ণ সিং। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে এপার বাংলার সাহিত্যে মুসলিম জীবনসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেন সহিদুল ইসলাম, তৈমুর খান, অনুপম অধিকারী, মনিরুদ্দীন খান, মইনুল হাসান এর মতো ব্যক্তি। প্রতিদিনই মুর্শিদাবাদ সহ আশপাশের জেলা থেকে আগত কবিরা তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

উপস্থিত জনদের কথায় উচ্চারিত হয় যে, বাংলা বিহার উড়িষ্যার একদা রাজধানী এই লালবাগ শহরে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যাশা মত বিকাশ ঘটেনি। কিন্তু জেলার বিভিন্ন প্রান্তে স্বাধীনভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির একেকটা নিজস্ব পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছে। দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে তাদের মধ্যে সংযোগ ঘটেছে, ভাবের আদান-প্রদান হয়েছে, এটা খুবই ইতিবাচক। রাজ্য জুড়ে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের জন্য নিজস্ব বৃত্তে যারা কাজ করে চলেছেন, এই সম্মেলনের সূত্রে তাদের মধ্যে যে একটা যোগসূত্র তৈরি হল তা অসামান্য সম্ভাবনাময়।

রোকেয়ার জন্মদিনে ভূমি-র সক্রিয়তা

নারীশিক্ষার অগ্রদূত মহীয়সী বেগম রোকেয়ার প্রয়াণ দিবসে (৯ আগস্ট) তাঁর ভাবনা ও কর্মদ্যোগ বিষয়ক আলোচনায় সমৃদ্ধ একটি স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ভূমিপুত্র উন্নয়ন মোর্চার পক্ষ থেকে। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের বইচিত্র সভাঘরে দুপুর ৩টেতে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে 'মহীয়সী রোকেয়া স্মারক সম্মান'-এ সম্মানিত করা হয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে, বিশিষ্ট সমাজসেবী মুন্সী আবুল কাশেম এবং আঞ্জুমানারা খাতুনকে। প্রধান অতিথি সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উল্লেখ করেন, বেগম রোকেয়া তাঁর ভাবনা এবং কর্মদ্যোগের মাধ্যমে নারীকে আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা মুসলিম সমাজকে পুরো নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই অসামান্য কাজের মর্যাদাপূর্ণ আলোচনা ও চর্চা তেমন চোখে পড়ে না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত গিয়াসউদ্দিন দালাল, আমজাদ হোসেন, এম এ ওহাব, সাইফুল্লা শামীম, সৌমিত্র ঘোষ দস্তিদার, আব্দুর রশিদ মোল্লা, ইসমাইল দরবেশ, মাকসুদা খাতুন, গৌতম মন্ডল, রামিজ রাজা, ঢাকা বাংলা একাডেমির অধিকর্তা শাহাদাত হোসেন প্রমুখ বিদ্বজ্জন নারী শিক্ষা জাগরণে রোকেয়ার ভূমিকা তুলে ধরেন। সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীসমাজের মধ্যে আধুনিক মনস্ক শিক্ষার প্রসারের উপর গুরুত্ব দেন তাঁরা। অনুষ্ঠানে মহীয়সী রোকেয়ার জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা সম্বলিত একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। এখানে রোকেয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখেছেন ইমানুল হক, মীরাতুন নাহার, দীপক সাহা, সুরঞ্জন মিদ্দে, আলিমুজ্জামান, অনল আবেদিন, ইসমাইল দরবেশ, আমিনুল ইসলাম, রমজান আলি, রুমা পারভীন, মুস্তারি বেগম প্রমুখ। কবিতা লিখেছেন তৈমুর খান, অরূপ গোস্বামী, মুহাম্মদ সাদউদ্দিনসহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদক রুহুল আমিন।

—ইনাস উদ্দীন

নির্বাচিত কবিতা : এক আলোকিত অঙ্গনে পা রাখা

কবিতা কি এবং কি নয়; কখন কোনো উচ্চারণ কবিতা হয় অথবা হয় না, তা নিয়ে অদ্যাবধি কেউ শেষ কথা বলতে পারেননি; হয়তো পারা সম্ভবও নয়। কিন্তু তারপরেও কবিতা রচনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে; পাশাপাশি কবিতা নিয়ে আলোচনাও চলছে নিরবচ্ছিন্ন ধারায়। আসলে সম্ভাব্য সব সীমাবদ্ধতার বাইরেও কবিতার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে বিরাট এক আকাশ, যেখানে এমন সব সত্যের নিত্য উদ্বোধন ঘটে যা সতত সুন্দর; অসত্য যাকে কোনোভাবে স্পর্শ করতে পারে না। তবে কথা হল, কবিতার এই নিত্য সৌন্দর্যলোকে পা রাখতে পারেন, স্বচ্ছন্দে পদচারণ করতে পারেন কত জন। তাঁদের সংখ্যা অবশ্যই বেশি নয়। তাই প্রতিদিন শত শত, সহস্র সহস্র কবিতা রচিত হলে বা কবির জন্ম হলেও দিন শেষে পরের দিনের পুব আকাশকে আলোকিত করার জন্য অবশিষ্ট থাকতে পারছেন খুব কম সংখ্যক কবিই। এক্ষেত্রে যারা পারছেন, সফল হয়েছেন তৈমুর খান অবশ্যই তাঁদের একজন।

নিয়মিত কবিতা পাঠকের কাছে তৈমুর খান এখন রীতিমতো পরিচিত নাম। কাব্য তার নিজস্ব ছন্দে হিল্লোলিত হয়েছে তাঁর কাব্যাঙ্গনে—'গ্রামের পাঠশালা থেকে কিশোরী মেঘ বেরিয়ে পড়েছে/গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে ছিটকে আসে তারা/স্বাদা ত্বক/পাতা দিয়ে সেলাই করেছে জামা, ঢেকে রেখেছে বুকের নদী/লাজুক মুখ লুকিয়ে শুধু হেসে যাচ্ছে কিশোরী মেঘ।' (শীতকাল) যে অনুভূতির গভীর থেকে উৎসারিত হয়েছে এই উচ্চারণ তার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের সাপেক্ষে কোনো শব্দবন্ধই যথেষ্ট নয়। এক একটা সময় আসে যখন কথা বলাটাই যেন অশিষ্টাচার বলে মনে হয়; তখন শুধু নীরবে অবনত মস্তকে প্রণতি জানানোই শ্রেয় হয়, এও তেমনি। জসীমউদ্দিন থেকে জীবনানন্দ দাশ, বাংলার গ্রাম্য প্রকৃতি নানারূপে ও ভাবে ভাস্বর হয়েছে বাংলা কাব্যক্ষেত্রে। তবে সে সব সৃষ্টির আবরণে এতটুকুও আবৃত হয়নি এ রচনা। এর নিজস্বতা অনস্বীকার্য, অনতিক্রম্য।

কবি তৈমুরের আরও এক বর্ণিল উদ্ভাস—'হাতের মুঠোয় পৃথিবীকে ছুঁড়েছি/বেঘোর মৃত্যুর শব্দে চুরমার ... আকাশ/রোদ চটা জলের জিভের নাম ধরে/বুকের আগুন ডাকে : আয় নদী।' (বুকের আগুন ডাকে : আয় নদী) একদিক থেকে দেখলে কবি-সাহিত্যিকদের অসহায়ত্বের সীমা পরিসীমা নেই। অনুভূতির নিজস্বতাকে উপযুক্ত রূপে লালন করতে না পারলে কবিতা-ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার কোনোরকম সম্ভাবনা নেই। এদিকে একান্ত নিজস্ব এই অনুভূতিকে যথার্থ রূপ দেওয়ার জন্য নেই নিজস্ব কোনো ভাষা। বহু ব্যবহারে দীর্ণ, জীর্ণ সব শব্দকে আশ্রয় করেই যা কিছু করার তা করতে হয়। সঙ্গত কারণে আভিধানিকতার বাঁধন ছেঁড়া ছাড়া কোনো পথ থাকে না। এখানেও তাই করা হয়েছে। আভিধানিক অর্থের সাপেক্ষে এ রচনা কিছুতেই ব্যাখ্যা যোগ্য নয়। একে উপলব্ধি করতে হলে ডুব দিতে হবে অনুভূতির সেই গহন গভীরে সহৃদয় সামাজিকের বাইরে যেখানে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। কবি তৈমুর তাঁর পাঠকের থেকে প্রত্যাশা করেছেন সেই অভিনিবেশ এবং নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অমন প্রত্যাশার সীমানা বরাবর।

উত্তরহীন জিজ্ঞাসার পীড়নে সতত দগ্ধ হওয়া আধুনিক মন ও মননের অনিবার্য ভবিতব্য বলে মনে করেন অনেকেই। কবি তৈমুরেও রয়েছে এমন ভাবনার উজ্জ্বল প্রতিবিম্বন—'অনেক রাম দশরথের বাবা। অনেক রাধা/ কৃষ্ণ জন্ম দেয়।/তেঁতুলতলা ঘোর লাগে .../আমার মা-ও রাধা ছিল নাকি!/বাবা কৃষ্ণ/কৃষ্ণ বাবা আমি।' (মায়া প্রত্ন রাধা চরিত কথা)

চলতি কথায় যাকে বলা হয়, মণিমুক্তাময় ছড়ানো অঙ্গন 'নির্বাচিত কবিতা তৈমুর খান' আক্ষরিক অর্থেই তাই। একটা সময় ছিল যখন যেমন তেমন করে কবিতার বইকে সুসজ্জিত করার ধারণা প্রাধান্য পেত। এখন ভাবনার বদল হয়েছে। কবিতা-রাণীকেও সাজানো হচ্ছে অসামান্য কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই এর ভূষণে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও রয়েছে তার ঘনিষ্ঠ অনুবর্তন। এটা পাঠকের জন্য অতিরিক্ত ভালোলাগার দিক।

—আজিজুল হক

নির্বাচিত কবিতা তৈমুর খান;আবিষ্কার, ২২৫/-

কবিতাকাঁথা : ভালোলাগা না লাগার সমীকরণ

'আমার বুকের অক্ষরেখা ধরে পাক খেতে খেতে/অনুভাব ঘুরে ঘুরে মরে মেরুকরণের ভয়ে/অবহেলার অন্তরালেও দরদ গলে পড়ে তার শুষ্ক/ঠোঁটে। অল্পবৃষ্টির স্বাদ পেল প্রণয়—সে এল না।' এই কবিতা-পংক্তিতে তেমন কোনো চমৎকারিত্ব আছে বা নেই, তা নিয়ে আমাদের বিশেষ মাথাব্যথা না করলেও চলবে। তবে একটা বিষয়ে আলাদা করে একটু নজর দিতেই হবে। যাকে বলে একান্তই নবাগত, এ কবিতার কবি নাসরিন আক্ষরিক অর্থেই তাই। 'কবিতাকাঁথা' (২০২২) তার সদ্য প্রকাশিত ও প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কবিতাগাথা-য় সংকলিত পঞ্চম কবিতা 'আর্দ্র আক্ষেপ'। আদ্র আক্ষেপ-এর অংশ বিশেষ উদ্ধৃতাংশ। শব্দ বা শব্দবন্ধ কোন গুণে কাব্য হয় তা নির্দিষ্ট করে বলার নয়। কবিতা অবশ্যই বিজ্ঞানের গবেষণাগারে তথ্য প্রমাণ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত করার মতো কোনো বিষয় নয়। এ হল একান্তই এক আত্মগত অনুভূতির অনন্য প্রতিবিম্বন। সমস্যা হল এমন প্রতিবিম্বিত সত্যও যে সকলের মনোদর্পণে সমানভাবে ছায়াপাত করবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। আসলে কবিকে ভর করতে হয় অনিশ্চয়তা নামক এক ভয়ঙ্কর সত্যের উপর। হিসাবের সামান্য ভুলচুক হলেই শেষ হয়ে যাবে সবকিছু। তাঁকে তাই প্রথমাবধি বেশ একটু মরিয়া হয়ে থাকতে হয়; নিজেকে ছড়িয়ে দিতে হয় দিগন্ত বরাবর। আমরা চমকিত হয়েছি নবাগত কবি নাসরিন এর মধ্যে এমন একটা মরিয়া অবস্থান লক্ষ করে। কোথাও কোনো সংকোচ নেই। নেই এতটুকুও পিছুটান। কাব্যাঙ্গনে পা রেখে নিজস্ব ক্ষেত্রটি চিনে নিতে তার সামান্যও সমস্যা হয়নি। নিজেকে মেলে ধরেছেন একান্ত নিজস্ব ছন্দে। রোমান্টিকতার ঘোলা জলে হাবুডুবু খাওয়া এই বয়সের কবি-মনের স্বাভাবিক প্রবণতা। কবি নাসরিন এক্ষেত্রে আশ্চর্য ব্যতিক্রম। রোমান্টিকতার মূল আধার যে প্রেম তা তার রচনায় ছায়াপাত করেছে বারেবারে; কিন্তু প্রেমার্তির যে ছড়ানো ভাব আমাদের কবিতার অঙ্গনকে মাঝেমধ্যেই দূষিত করে তা থেকে নাসরিন নিজেকে হেফাজত করতে সক্ষম হয়েছেন—'তরবারি সে অযত্নে সাজিয়েছি ভোঁতা দালানের/গায়ে, রাজপুত্রের পাতলা বীর্যধারা শিকড় গাঁথতে/পারেনা আজ আমার অস্ত্রপচারে বিক্ষত অনুর্বর/চিন্তার গর্ভে।' তার এই অর্জন আমাদের স্বস্তি দেয়; অন্য এক প্রত্যাশার রঙ্গে রঞ্জিত হই আমরা।

এবং এখানেই শেষ নয়। কবিতাকাঁথায় আরও সব সম্ভাবনা ক্ষেত্রকেও বিশেষভাবে আলোকিত করেছেন নাসরিন। যন্ত্রসভ্যতার অভিঘাতে, বিশেষত বিশ্বযুদ্ধোত্তর ধ্বস্ত বাস্তবতায় কবিতার যে জন্মান্তর হয়েছে, যে এক সর্বাত্মক বিপন্নতার চোরাবালিতে নিমজ্জিত হয়েছে আধুনিক কবিমন তা থেকে পরিত্রাণ নেই আমাদের কারোরই। এখন কথা হল, এমন বিপন্নতাই কী শেষকথা হয়ে উঠবে! তা নিশ্চয়ই নয়। অন্তত কবিতা-ক্ষেত্রে তো নয়ই। তাহলে তো সব দীপই নিভে যায় নিঃশেষে। আর কিছু না হোক কবির কাছে, কবিতার অঙ্গনে শেষ একটা আশ্রয় খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করতে চায় সংবেদনশীল মননমাত্র। কবিতা বা কবিকে তাই আলাদা করে কিছু দায়বদ্ধতার ভার বইতেই হয়। এই দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতে গিয়ে আমাদের কবিকূল প্রায়শঃ নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন না। তাঁদের রচনা বেশ একটু প্রচার ধর্মী হয়ে পড়ে; কবিতা শিল্পের পবিত্র সত্য থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়। কবি নাসরিন এক্ষেত্রে আমাদেরকে আলাদা করে আস্বস্ত করেন। তাঁর কবিমনের অনন্য উচ্চারণ-স্পর্শে পুলকিত হতে পারি আমরা—'ও সখি এ কোন সময়ে এলি কাছে/দুপুর ছুঁয়ে একাকী আকাশ আছে... সখি এ কোন সময়ে শুকনো গালে গাল ছোঁয়ালি/তেল দিলি, জল দিলি, চিবুক ছুঁয়ে মায়া নিলি...।' (নির্ঝর) কথা এখানে কথা মাত্র নয়; সময়ের বিপন্নতা, ব্যক্তিচেতনার নিদারুণ অসহায়ত্ব, অনিঃশেষ রক্তক্ষরণের যন্ত্রণা সব যেন এক মুহূর্তে ভাস্বর হয়েছে মামুলি সব শব্দের বাঁধনে।

এমন অনন্য উচ্চারণে ঋদ্ধ কবিতাকাঁথা একটা ক্ষেত্রে কিন্তু বেশ অস্বস্তিরও কারণ হয়েছে। বই এর মুদ্রণশৈলী বিষয়ক যে সত্যের স্পর্শে আজ আমরা বিশেষ করে তপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করি এখানে তার একটু বেশি রকমের অভাব আছে।

—সেক আপতার হোসেন

কবিতাকাঁথা, নাসরিন, দেশের আয়না, ১২৫/-